শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা
প্রফেসর আ ব ম ফারুক
আবু মুহম্মদ
মোঃ আবদুল হক
মোঃ তাজমুল হক
জসিম উদ্দিন আহম্মদ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়টি 'সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন' এই জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। সপ্তম শ্রেণির **শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য** বিষয়টি মূলত ব্যাবহারিক বিষয়। তাই হাতে কলমে শিক্ষার জন্য বইটিতে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক অংশের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। বইটি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা, পুষ্টিজ্ঞান, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, প্রজননস্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। একইসাথে বিভিন্ন ধরনের শরীরচর্চা ও খেলাধুলার যথার্থ নিয়মকানুন জেনে একজন সুস্থ ও কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	শরীরচর্চা ও সুস্থজীবন	১–১১
দ্বিতীয়	স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং	১২–২৩
তৃতীয়	স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরিচিতি ও স্বাস্থ্যসেবা	২৪–৩০
চতুর্থ	বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা	৩১–৩৩
পঞ্চম	জীবনের জন্য খেলাধুলা	৩৪–৫৬

প্রথম অধ্যায়

শরীরচর্চা ও সুস্থজীবন

মানুষের দেহের সাথে মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে দৈহিক উন্নতির সাথে সাথে ব্যক্তির মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক উন্নতিও সম্পৃক্ত হয়েছে। শারীরিক অঙ্গসঞ্চালন ও খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা অর্জন, চিত্তবিনোদন, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা অর্জন করা যায়। দৈহিক গঠন ও মানসিক বিকাশ সাধন করে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে সুস্থ জীবনযাপনই হলো এর মূল লক্ষ্য।

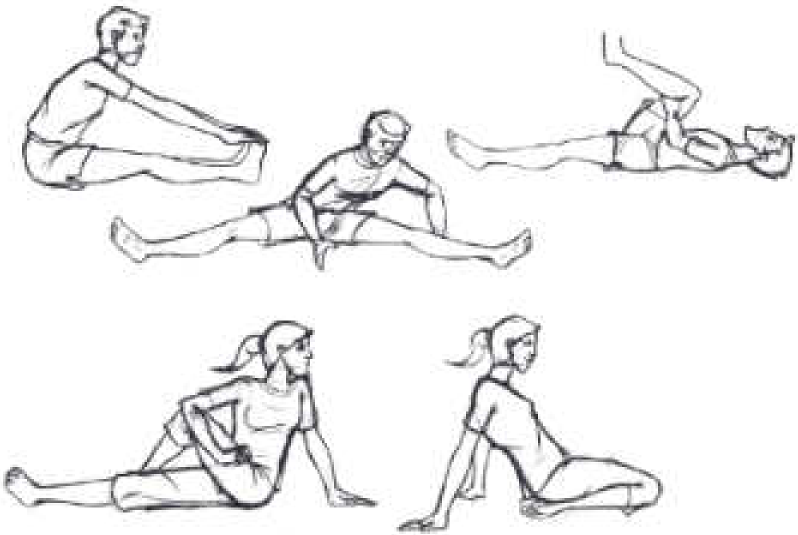

বিভিন্ন রকম শরীরচর্চা

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

১. ধারাবাহিকতাসহ বিদ্যালয়ে প্রাত্যহিক সমাবেশের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব।

২. সুস্থ জীবনের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি বর্ণনা করতে পারব।

৩. শরীর গঠনের জন্য ব্যায়ামের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।

৪. অতিরিক্ত ব্যায়ামের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।

৫. সরঞ্জামবিহীন ও সরঞ্জামসহ ব্যায়ামের নিয়মকানুন বর্ণনা করতে পারব।

৬. প্রাত্যহিক জীবনে সময়ানুবর্তিতা অনুসরণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হব।

৭. ব্রতচারী নৃত্য অনুশীলন করতে পারব।

৮. নিয়মকানুন মেনে সরঞ্জামসহ ব্যায়াম করতে পারব।

পাঠ–১ : প্রাত্যহিক সমাবেশের নিয়মাবলি

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রত্যহ ক্লাস শুরু হওয়ার পূর্বে শৃঙ্খলা সাথে সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ের সামনের মাঠে বা খোলা জায়গায় উপস্থিত হবে। শিক্ষার্থীরা সমাবেশে হাউজ বা শ্রেণি অনুসারে দাঁড়াবে। প্রধান শিক্ষক, শ্রেণিশিক্ষক, শারীরিক শিক্ষক ও সমাবেশ পরিচালনাকারী শিক্ষার্থীরা যার যার নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর সময় অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার শিক্ষার্থীরা সামনে দাঁড়াবে, বড়োরা ক্রমান্বয়ে পিছনে দাঁড়াবে।

সমাবেশের ধারাবাহিক কার্যক্রম –

১. **জাতীয় পতাকা উত্তোলন** : জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় সকলে 'সোজা' বা 'অ্যাটেনশন' অবস্থায় থাকবে। কেউ নড়াচড়া করবে না। প্রধান শিক্ষক বা একজন সিনিয়র শিক্ষক পতাকা উত্তোলন করবেন।

২. **জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন** : সমাবেশ পরিচালনাকারী শিক্ষার্থী যখন বলবে– 'পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করো', তখন সকলে একসাথে পতাকার উদ্দেশ্যে ডান হাত কপাল বরাবর তুলে অভিবাদন জানাবে। যখন বলবে, 'হাত নামাও', তখন একসাথে হাত নামাবে।

৩. **ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ** : একজন শিক্ষার্থী সামনে এসে তার নিজ ধর্মগ্রন্থ থেকে নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করবে। অন্য শিক্ষার্থীরা মন দিয়ে শুনবে। এ সময় সকল শিক্ষার্থী 'আরামে দাঁড়ানো' অবস্থায় থাকবে।

৪. **শপথ গ্রহণ** : শপথ গ্রহণের সময় সকল শিক্ষার্থী 'সোজা' অবস্থায় থাকবে। ডান হাত কাঁধ বরাবর তুলবে। হাতের তালু খোলা, তবে আঙ্গুলগুলো একত্র থাকবে। একজন শিক্ষার্থী সামনে এসে শপথবাক্য পাঠ করবে এবং সকল শিক্ষার্থী সমস্বরে তার সাথে তা পাঠ করবে। শপথ গ্রহণ শেষে 'হাত নামাও' বলার সাথে সাথে সকলে একসাথে হাত নামাবে।

৫. **জাতীয় সংগীত** : শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থী সকলে 'সোজা' অবস্থায় থাকবে এবং সকলে একসাথে জাতীয় সংগীত গাইবে।

৬. **প্রধান শিক্ষকের ভাষণ** : প্রধান শিক্ষক বা তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনো সিনিয়র শিক্ষক ভাষণ দেবেন।

৭. **শরীরচর্চা অনুশীলন** : ভাষণ শেষে শারীরিক শিক্ষক পাঁচ মিনিট সমবেত ব্যায়াম করাবেন। তবে এমন ধরনের সমবেত ব্যায়াম (পিটি) করানো যাবে না, যাতে শিক্ষার্থীদের জামাকাপড়ে ময়লা লাগে।

৮. সমাবেশ শেষে শ্রেণিশিক্ষক বা শ্রেণির দলনেতার নেতৃত্বে শিক্ষার্থী সারিবদ্ধভাবে স্ব স্ব ক্লাসে চলে যাবে।

কাজ–১ :	সমাবেশে কে কোথায় দাঁড়াবে তা মাঠে গিয়ে প্রদর্শন কর।

পাঠ–২ : প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধির ধারণা

স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার পালনীয় বিধিবিধানই হলো স্বাস্থ্যবিধি। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞানগুলো ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য অর্জন সম্পর্কে সচেতন করে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ভালো রাখতে যা কিছু করা বা নিয়ম পালনের প্রয়োজন, তা ব্যক্তিকেই করতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষায় যেসব বিধি মেনে চলতে হয়, তা আলোচনা করা হলো –

১. **শারীরিক পরিচ্ছন্নতা :** রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আমাদের শারীরিকভাবে পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন। দেহ অপরিষ্কার বা অপরিচ্ছন্ন থাকলে রোগ-জীবাণু সহজে দেহে প্রবেশ করে। এ জন্য পরিচ্ছন্ন থাকার নিয়মগুলো পালন করতে হবে। যেমন-

১.১ **নিয়মিত গোসল :** বিভিন্ন কাজকর্ম ও খেলাধুলা করার সময় গায়ে ময়লা লেগে শরীর অপরিচ্ছন্ন হয়। এতে শরীরে জীবাণু ঢোকে। এ জন্য প্রতিদিনই গোসল করা উচিত। গোসলের সময় সাবান মাখা ভালো। এতে সহজে ময়লা ও ঘামের গন্ধ দূর হয়।

১.২ **দাঁত ও মুখ পরিষ্কার :** সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং আহারের পর দাঁত ও মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। দাঁত না মাজলে দাঁতের ফাঁকে খাদ্যকণা জমে মুখে দুর্গন্ধ ছড়ায় ও দাঁতের ক্ষতি করে। রাতে শোয়ার আগে দাঁত পরিষ্কার করা উচিত। Lorem ipsum

১.৩ **চুলের যত্ন :** শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয় বরং দেহের পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রত্যহ চুলের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। গোসলের পর প্রত্যহ চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো ভালো। এতে চুলের গোড়া শক্ত হয় ও চুলের ভেতর ময়লা জমতে পারে না। সপ্তাহে কমপক্ষে দুই দিন চুল সাবান/শ্যাম্পু দিয়ে ধোয়া উচিত।

১.৪ **নখ কাটা :** হাতের নখ একটু বড়ো হলেই কেটে ফেলা উচিত। নখ বড়ো হলে তার মধ্যে ময়লা জমে থাকে। আহারের সময় সেই ময়লা খাবারের সাথে পেটে প্রবেশ করে এবং নানা রকম পেটের অসুখ ও কৃমি হয়।

১.৫ **হাত পরিষ্কার করা :** হাত দিয়ে আমরা সবকিছু ধরি ও নানা রকম কাজ করি।এ জন্য হাতে ময়লা লেগে থাকে। হাত পরিষ্কার না করে সেই হাত দিয়ে খাবার খাওয়া ঠিক নয়। খাবার আগে ও পরে প্রতিবারই হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করা উচিত।

১.৬ **মলমূত্র ত্যাগ :** সকালে শয্যাত্যাগের পর মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস করা ভালো। মলমূত্র ত্যাগের বেগ কখনো দমন করা উচিত নয়। দৈনিক খাদ্যতালিকায় ফলমূল ও শাকসবজি থাকা ভালো। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না, সহজে মলত্যাগ করা যায়। প্রতিদিন একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের গড়ে ১০/১২ গ্লাস পানি পান করা প্রয়োজন। এতে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ ঘাম ও প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে যায়।

২. **বাসগৃহের পরিচ্ছন্নতা :** ঘরে যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস সহজে প্রবেশ করতে পারে, এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জানালা, দরজা থাকতে হবে। ঘর ও এর আশপাশ সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে। ঘরের মেঝে প্রতিদিন সকাল- বিকেল মুছতে বা ঝাড়ু দিতে হবে। কাঁচাঘর হলে মাঝে মাঝে লেপতে হবে। পাকাদালান হলে কয়েক বছর পর পর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও রং করা উচিত।

৩. **খাদ্য গ্রহণের নিয়ম :** খাদ্য গ্রহণে যে সকল নিয়ম পালন করা ভালো-

৩.১ নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খেতে হবে।

৩.২ পচা, বাসি খাবার পরিহার করতে হবে। যে খাদ্য সহজে হজম হয়, তেমন খাবার খাওয়া উচিত।

৩.৩ খাবার চিবিয়ে ও ধীরে ধীরে খেতে হবে।

৩.৪ বেশি না খেয়ে পরিমিত খাবার খেতে হবে।

৩.৫ সব ধরনের খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

৩.৬ খাবারে শাকসবজির পরিমাণ বেশি থাকতে হবে।

৪. পোশাক-পরিচ্ছদ : দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি, শীত ও উত্তাপ থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্য সময়োপযোগী পোশাক পরা উচিত। পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রত্যহ ধুয়ে শুকানো ভালো। ঘামযুক্ত বা ২/৩ দিনের ব্যবহার করা কাপড় একনাগাড়ে পরা অস্বাস্থ্যকর।

৫. খেলাধুলা ও ব্যায়াম : শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা উচিত। তবে মনে রাখতে হবে, অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। সামর্থ্য অনুযায়ী খেলাধুলা ও পরিমিত ব্যায়াম করতে হবে। তাহলে শরীর সুস্থ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সুদৃঢ় হবে।

৬. বিশ্রাম ও ঘুম : দৈহিক পরিশ্রম ও ব্যায়ামের ফলে দেহের কোষগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত ও নিস্তেজ হতে থাকে। জীবকোষগুলো পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বিশ্রাম ও ঘুমের প্রয়োজন। একজন সুস্থ লোকের দৈনিক ৭/৮ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন। এতে জীবকোষগুলো সতেজ ও মস্তিষ্কের কোষগুলোর ক্ষয়পূরণ হয়।

৭. অভ্যাস : 'মানুষ অভ্যাসের দাস'। তবে কিছু অভ্যাস আছে যা পরিত্যাগ করতে হবে। একবার অভ্যাস খারাপ হয়ে গেলে তা সংশোধন করতে সময় লাগে। সেজন্য সব সময় খারাপ অভ্যাস যাতে গড়ে না ওঠে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। সুঅভ্যাস গঠনের জন্য যে সকল বিষয়গুলো অনুসরণ করা যেতে পারে-

৭.১ অধিক রাত পর্যন্ত জেগে না থাকা।

৭.২ সূর্য ওঠার পরও ঘুমিয়ে না থাকা।

৭.৩ নির্দিষ্ট সময়ে পরিমিত স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া।

৭.৪ যেখানে-সেখানে মলমূত্র ত্যাগ না করা।

৭.৫ অযথা সময় নষ্ট না করা।

কাজ-১ :	শারীরিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য কী কী কাজ করতে হবে তার তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-৩ : শারীরিক সুস্থতায় ব্যায়ামের প্রভাব

দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং আনন্দলাভের জন্য নিয়মিতভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করার নামই ব্যায়াম। ব্যায়াম দেহ ও মনকে বলিষ্ঠ এবং সংযত করে। ফলে শক্তি ও সহিষ্ণুতা বাড়ে, হৃৎপিণ্ড সতেজ হয়, হজমশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শরীরের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যায়ামের বিষয় নির্বাচন করতে হয়। পরিমিত ব্যায়াম স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সহায়ক। ব্যায়াম করার সময় তাড়াহুড়া করতে নেই। ব্যায়ামের মধ্যে কিছুক্ষণ বিরতির প্রয়োজন। এই বিরতি নতুন করে ব্যায়াম করার শক্তি জোগায়। অনিয়মিত, অসময় এবং যথেচ্ছা ব্যায়াম করা উচিত নয়। শিশুর দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যায়াম তথা শরীরচর্চা কর্মসূচিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। পরিমিত ব্যায়াম দ্বারা দেহের অস্থি, মাংসপেশি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সুষম বৃদ্ধি ঘটে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যায়ামের কর্মসূচি সহজ থেকে ক্রমশই কঠিন হবে। অর্থাৎ ক্রমাগত উন্নত হবে। এভাবে ব্যায়াম অনুশীলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। ব্যায়াম অনুশীলনের কর্মসূচিতে দীর্ঘ বিরতি থাকবে না। ব্যায়াম অনুশীলনের সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যায়ামের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে হবে। যেমন: মাথা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে পা পর্যন্ত এসে শেষ করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য ব্যায়াম অপরিহার্য। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যায়াম ও খেলাধুলা বেশি প্রয়োজন। এ সময়ে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক গঠন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শারীরিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়।

কাজ–১ : শারীরিক সুস্থতার জন্য ব্যায়ামের ভূমিকা বর্ণনা কর।

পাঠ–৪ : অতিরিক্ত ব্যায়ামের কুফল

আমাদের জীবনের সব ধরনের কর্মকাণ্ডেরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ রয়েছে। অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। অধিক পরিমাণে খাবার গ্রহণ যেমন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তেমনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যায়ামও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আবার যখন-তখন ব্যায়াম করা ঠিক নয়। সকালে বা বিকেলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন ব্যায়াম করা উচিত। আবার খাবার গ্রহণের পরে ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়। বয়স ও লিঙ্গ ভেদে ব্যায়াম নির্বাচন করা উচিত। যেমন:

১. শিশুদের ভারী জিনিস তোলার ব্যায়াম করালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্নতি বা বৃদ্ধির চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে।

২. শিশুদের ৩০/৪০ মিনিটের বেশি ব্যায়াম করালে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

৩. এলোমেলোভাবে ব্যায়াম যেমন: একবার হাতের ব্যায়াম, পরে নিচে শুয়ে ব্যায়াম, তারপরে শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম–এভাবে ব্যায়াম না করে ধারাবাহিকভাবে ব্যায়াম অনুশীলন করতে হবে। তা না হলে শরীরের ক্ষতি হবে।

৪. ভরাপেটে ব্যায়াম পরিত্যাজ্য। খাওয়ার পরপরই ব্যায়াম করলে পেটে ব্যথা ও বমি হবে।

৫. ব্যায়ামের মধ্যে বিরতি না দিয়ে একাধারে ব্যায়াম করলে শরীর অবশ হয়ে আসবে।

৬. ব্যায়াম করার পূর্বে শরীর গরম (warm up) করে নিতে হবে। শরীর গরম না করে ব্যায়াম শুরু করলে মাংসপেশিতে টান পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

৭. প্রথমে সহজ ব্যায়ামগুলোর অনুশীলন করিয়ে ক্রমান্বয়ে কঠিনের দিকে যেতে হবে তা না হলে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বে।

৮. সকালে খালি পেটে ব্যায়াম করা উচিত নয়। খালি পেটে ব্যায়াম করলে বমি বা পেট ব্যথা শুরু হবে।

উল্লিখিত অতিরিক্ত ব্যায়ামের কুফলগুলো বিবেচনায় রেখে ব্যায়ামের বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। তাহলেই শারীরিক সুস্থতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

কাজ–১ : ব্যায়াম কী? কখন কীভাবে ব্যায়াম করা উচিত তার একটি তালিকা তৈরি কর।

কাজ–২ : অতিরিক্ত ব্যায়ামের কুফলগুলো লিখ এবং দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা কর।

পাঠ–৫ : সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম

আমাদের অনেকেরই এমন ধারণা রয়েছে যে সরঞ্জাম ছাড়া কোনো খেলাধুলা করা যায় না। এ ধারণা সঠিক নয়। সরঞ্জাম ছাড়াও নানা ধরনের ব্যায়াম করা যায়। সরঞ্জাম ছাড়া ব্যায়ামকে 'ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ' বা 'মুক্ত হস্তে ব্যায়াম' বলে। লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, ডিগবাজি, হেডস্ট্যান্ড, পিটি বা সমবেত ব্যায়াম–এ সবই সরঞ্জামবিহীন ব্যায়ামের অন্তর্ভুক্ত। সরঞ্জামবিহীন ব্যায়ামের কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো–

১. **দম** : খেলাধুলা করতে হলে দমের প্রয়োজন হয়। দম বা শারীরিক সহনশীলতা না থাকলে কোনো খেলাধুলায় সফলতা অর্জন করা যায় না। দম না থাকলে শরীরে শক্তি পাওয়া যায় না। ফলে তখন কোনো খেলা

ঠিকভাবে অনুশীলন করা যায় না। যেমন: অনবরত হাঁটলে বা একটানা দৌড়ালে দম বৃদ্ধি পায়। দম বৃদ্ধির জন্য নিচের ব্যায়ামের অনুশীলন করতে হবে।

১.১ একঘন্টা ধীরগতিতে দৌড়াতে হবে। দৌড়ের মাঝে কোনো বিরতি থাকবে না।

১.২ একটানা দ্রুত হাঁটতে হবে– কখনো থামা যাবে না। এতে দম বৃদ্ধি পাবে।

১.৩ উঁচু–নিচু জায়গার উপর দিয়ে দৌড়াতে হবে। অবশ্য খেলোয়াড়দের বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে। এভাবে বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করলে খেলোয়াড়দের দম বৃদ্ধি পাবে।

২. কব্জি ও কোমরের ব্যায়াম : র‍্যাকেট জাতীয় খেলাধুলার জন্য কব্জির শক্তি বেশি প্রয়োজন। যেমন: টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট, হকি ইত্যাদি। ক্রিকেট বল ব্যাটে লাগার সাথে সাথে কব্জির মোচড়ে যেকোনো দিকে বল পাঠানো যায়। ব্যাডমিন্টন খেলায় স্ম্যাশ করার সময় কব্জির শক্তি বেশি হলে স্ম্যাশ সফল হয়। বিভিন্নভাবে হাত ঘুরিয়ে কব্জির ব্যায়াম করা যায়। মাটিতে দুহাত রেখে শরীর উপরে–নিচে তুললেও কব্জি তথা হাতের শক্তি বাড়ে। চিন আপ, পুশ আপও কব্জির শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। কোমরের ব্যায়াম করতে হলে শরীর বিভিন্নভাবে অর্থাৎ ডানে বামে ঘুরিয়ে কোমরের ব্যায়াম করতে হয়। পিঠে কাউকে তুলে নিয়ে শরীর আপ–ডাউন করলেও কোমরের শক্তি বাড়ে। এভাবে ব্যায়াম করে কব্জি ও কোমরের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়।

৩. কনুই ভেঙে বসে ব্যায়াম : মাটিতে পা সামনে সোজা রেখে বসতে হবে। হাত দুটি শরীরের দুপাশে মাটির উপর থাকবে। এরপর হাতের উপর ভর দিয়ে শরীর উপরে তুলতে ও নামাতে হবে। শরীর উপরে নিচে উঠা–নামা করার সময় পা দুটো একত্র ও সোজা থাকবে।

কাজ–১ : সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম বলতে তোমরা কী বুঝ?
কাজ–২ : দুটি সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম প্রদর্শন কর।

পাঠ–৬ : সরঞ্জামসহ ব্যায়াম

সরঞ্জাম নিয়ে যে ব্যায়াম করা হয়, তাকে সরঞ্জামসহ ব্যায়াম বলে। সরঞ্জাম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে খেলাধুলার সরঞ্জাম থেকে ব্যায়ামের সরঞ্জাম ভিন্ন। যেমন– স্কিপিং রোপ, রোমান রিং ও ফ্রিজবি ইত্যাদি।

৬.১ স্কিপিং : স্কিপিং রোপের মাধ্যমে যে ব্যায়াম করা অর্থাৎ লাফানো হয় তাকে স্কিপিং বলে। নানাভাবে স্কিপিং করা যায়।

ক. ৮/১০ জন এক লাইনে দাঁড়িয়ে স্কিপিং করতে করতে দৌড়িয়ে সামনে যাবে ও ফিরে আসবে।

খ. এক জায়গায় দাঁড়িয়ে স্কিপিং করা যায়। একটানা ৫ মিনিট সবাই স্ব স্ব জায়গায় দাঁড়িয়ে স্কিপিং করবে।

গ. আবার ৬টি স্কিপিং রোপ ১০ ফুট অন্তর অন্তর দুজন দুমাথা টেনে ধরল। প্রথমটি ২ ফুট উঁচুতে, পরেরটি ৩ ফুট উঁচুতে এভাবে পর পর স্কিপিং রোপ ধরতে হবে। শিক্ষার্থীরা ফাইলে দাঁড়াবে। একজন একজন করে দৌড়ে প্রথমটির উপর দিয়ে লাফ দিয়ে পার হয়ে এবং পরেরটির নিচ দিয়ে এভাবে স্কিপিং রোপ অতিক্রম করতে হবে। যে অল্প সময়ে স্কিপিং রোপগুলো ক্রস করে ফিরে আসতে পারবে তার শক্তি ও শরীরের নমনীয়তা ভালো বলে গণ্য হবে।

৬.২ রোমান রিং : দুটি রশির সাথে দুটি লোহার রিং ঝুলানো থাকে, একে রোমান রিং বলে। এই রিং ধরে বিভিন্ন কায়দায় নানাপ্রকার ব্যায়াম করা যায়। গ্রামের স্কুলগুলোতে গাছের ডালের সাথে বেঁধে অথবা বাঁশ দিয়ে আড়া বানিয়ে সেখানেও রোমান রিংয়ের রশি বেঁধে এ ব্যায়াম করা যায়। যেমন–

(ক) দুই হাত দিয়ে সুইং করে বিভিন্ন কায়দায় দোল খাওয়া যায়।

(খ) রিং ধরে দুই পা সামনে একত্র করে পায়ের 'এল পজিশন' করা।

(গ) রিং ধরে হাতের উপর ভর করে মাথা নিচের দিকে এনে হ্যান্ডস্ট্যান্ড করা ইত্যাদি।

৬.৩ ফ্রিজবি : ফ্রিজবি থালার মতো সিন্থেটিক প্লাস্টিকের একটি গোল চাকতিবিশেষ। রাবারের তৈরি বলে এটি হালকা হয়। ছেলেমেয়েরা এ দিয়ে খেলতে প্রচুর আনন্দ পায়। একজন ঐ চাকতি ধরে দূরে ছুড়ে দেবে অপরজন সে চাকতি ধরে ঐ প্রান্ত থেকে পুনরায় ছুড়ে দেবে। এভাবে ২/৩ জন বা ৩/৪ জনের মধ্যে ছোড়াছুড়ি করে খেলা যায়। এই ছোড়াছুড়ি খেলাকেই ফ্রিজবি বলে। এ খেলার মাধ্যমে হাতের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

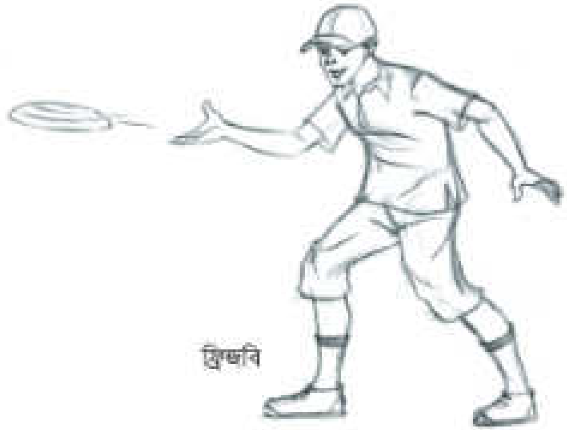

ফ্রিজবি

পাঠ–৭. ব্রতচারী ব্যায়াম বা লোকজ ব্যায়াম

শারীরিক ব্যায়াম ও সুন্দর দেহ গঠনের জন্য চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ ব্যায়াম দ্বারা সে অঞ্চলের কৃষ্টি, প্রথা প্রভৃতি ফুটিয়ে তোলা যায়। এতে ছাত্রছাত্রীদের একদিকে যেমন চিত্তবিনোদন হয়, অপরদিকে বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সহজ হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগীতির মাধ্যমে যে লোকজ ব্যায়াম করা হয়, এ সবই হলো ব্রতচারী ব্যায়াম বা লোকজ ব্যায়াম। ব্রতচারী ব্যায়াম হলো : ১. কাঠি নাচ ২. ঝুমুর নাচ ৩. লড়ি নাচ

নিচে ঝুমুর নাচের বর্ণনা করা হলো–

ঝুমুর নাচ :

নাচের কৌশল–

ক. শিক্ষার্থীরা দুই সারিতে দাঁড়াবে। এক সারিতে কম সংখ্যক এবং অপর সারিতে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীরা থাকবে। ছোটো সারিটি বড়ো সারির বাম দিকে দাঁড়াবে।

খ. প্রথম সংকেত হওয়ার সাথে সাথে সকলে লাফ দিয়ে পা জোড়া ও কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াবে।

গ. দ্বিতীয় সংকেতে দুই সারির সকলে দৌড় অবস্থায় বাম দিকে ঘুরতে ঘুরতে দুটি বৃত্ত বানাবে। ছোটো বৃত্তের বাইরে বড়ো বৃত্তটি থাকবে।

ঘ. তৃতীয় সংকেত পাওয়া মাত্র বৃত্তের ভেতরের দিকে মুখ করে নিজ জায়গায় দাঁড়াবে। বাজনার তালে পা উঠানামা করতে থাকবে। হাত দুটি প্রসারিত করে দূরত্ব ঠিক করে নিবে।

ঙ. চতুর্থ সংকেতে পায়ের উঠা–নামা থামাবে এবং সাথে সাথে হাত দুই পাশে চলে আসবে।

চ. পঞ্চম সংকেতে দুই হাত কোমরে দিয়ে বৃত্তের বাম দিকে ১ থেকে ৭ স্টেপ ফেলবে। তিন গণনায় দুই হাত সামনে–নিচে আসবে। এভাবে দুইবার করতে হবে।

ছ. ষষ্ঠ সংকেত শোনামাত্র বাম হাত মাথার বাম পাশ দিয়ে ১ থেকে ৭ স্টেপ ফেলবে ও তিন গণনায় হাত নিচে চলে আসবে।

জ. সপ্তম সংকেতে ডান হাত মাথার ডান পাশ দিয়ে ১ থেকে ৭ স্টেপ ফেলবে। প্রত্যেকবার তিন গণনায় সময় হাত নিচে আসবে।

ঝ. অষ্টম সংকেতে দুই হাত মাথার উপরে আসবে ও ১ থেকে ৭ স্টেপ ফেলবে। এভাবে বাজনার তালে তালে নৃত্য এগুতে থাকবে।

ঝুমুর নৃত্যের গান–

আগা ডালে বসা কোকিল
মাঝ ডালে বাসারে–
ভাঙ্গিল বিরিখির ডাল
জীবনে নেই আশারে।
অকালে পুষিলাম পাখি
ঘিরত মধু দিয়ারে–
সুকালে পালাইলেন পাখি
দারুণ শেল দিয়ারে ।
অকালে পুষিলাম পাখি
খুদ কুঁড়া দিয়ারে–
সুকালে পালাইলেন পাখি
দারুণ শেল দিয়া রে।

ঝুমুর নৃত্যের মাদলের বোল

ধাতিন তাতাক্ তিন্‌ধা ধাতিন্ ধাতিন্ তাতাক্ থি
ধাতিন তাতাক্ তিনধা ধাতিন্ ধাতিন্ তাতাক্ থি
ধাতিন তাতাক্ তিনধা ধাতিন্ থি, থি, থি।

কাজ–১ : স্কিপিং রোপ দ্বারা কত প্রকারের ব্যায়াম করা যায়। প্রদর্শন করে দেখাও।

কাজ–২ : ফ্রিজবি কী? ফ্রিজবি খেলাটি প্রদর্শন কর।

পাঠ– ৮ : এডুকেশনাল জিমন্যাস্টিক্স

আধুনিক জিমন্যাস্টিক্সের সূচনা জার্মানিতে হলেও এর লক্ষ্য ছিল শুধু বলিষ্ঠ দেহ গঠন। কিন্তু শরীর ও মনের সুসমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যায়াম করা হয়, তাকে শিক্ষামূলক জিমন্যাস্টিক্স বলে। এর উদ্দেশ্য হলো –

১. শিক্ষামূলক জিমন্যাস্টিক্স অনুশীলনের ফলে শিশু ক্রমান্বয়ে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক গুণাবলি অর্জন করতে পারে।

২. বিদ্যালয়েই শিশুর নৈতিক গুণাবলি অর্জিত হয়।

৩. শিক্ষামূলক জিমন্যাস্টিক্সের অনুশীলনগুলো পরিকল্পনামাফিক হয় বলে বাস্তব জীবনে এর প্রভাব পড়ে।

এডুকেশনাল জিমন্যাস্টিক্সের কয়েকটি ব্যায়ামের উদাহরণ দেওয়া হলো–

ক. সম্মুখ ডিগবাজি : দুই হাঁটু ভাঁজ করে, দুই পায়ের পাতা ও দুই হাতের তালুর উপর ভর করে থাক। এরপর কোমর উপরের দিকে তুলে ঘাড় ও মাথা দুই হাতের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে সামনে গড়িয়ে পড়। মেঝেতে পা স্পর্শ করার সাথে সাথে সোজা হয়ে দাঁড়াও। ডিগবাজি খাওয়ার সময় মাথা যাতে মাটিতে বা ম্যাটে না লাগে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সম্মুখ ডিগবাজি

খ. পিছনে ডিগবাজি : যেদিকে ডিগবাজি দেবে সেদিকে পিছন ফিরে দাঁড়াও। তারপর শরীরটা ক্রমাগত নিচু করে এবং শরীরের পিছনের অংশ অর্থাৎ নিতম্ব মেঝেতে বা ম্যাটে লাগার সাথে সাথে দুই হাতের তালু কাঁধ বরাবর ম্যাটের দুই পাশে রাখ এবং শরীরটা পিছনে ঘুরিয়ে নাও। কোমর থেকে শরীরের উপরা অংশ তুলে দাঁড়াবার জন্য পা মাটি ছোঁয়ার সাথে সাথে হাতের তালু দিয়ে মাটিতে ধাক্কা দাও এবং সোজা হয়ে দাঁড়াও।

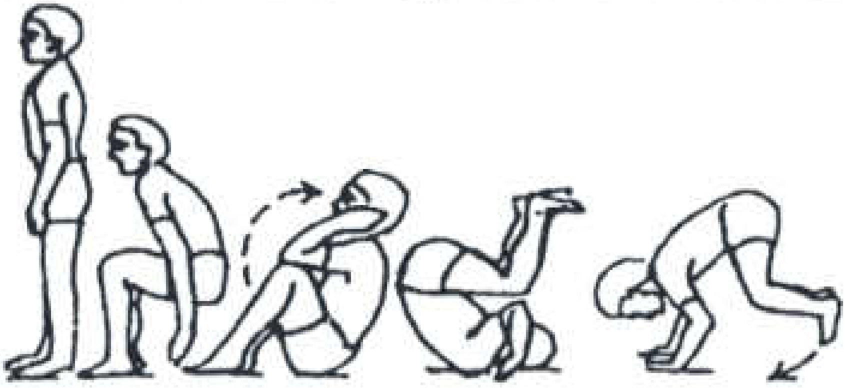

পিছনে ডিগবাজি

গ. **পার্শ্ব ডিগবাজি :** সম্মুখ ডিগবাজির ন্যায় ম্যাটের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে শরীরের এক পাশে বা কাঁধে ভর করে কাত অবস্থায় শরীরটা ঘুরিয়ে নাও। ঘোরার সময় আঘাত এড়ানোর জন্য এক হাত ম্যাটের উপর পেতে নেবে এবং পা মাথার কাছে টেনে নেবে। এবার কাঁধের সাহায্যে একপাশে গড়িয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াও।

কাজ–১ : এডুকেশনাল জিমন্যাস্টিক্স বলতে কী বুঝ? বর্ণনা কর।

কাজ–২ : ফ্রন্ট রোল দেওয়ার কৌশলগুলো প্রদর্শন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। একজন সুস্থ লোকের দৈনিক কত ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন?

ক. ২/৩ খ. ৭/৮

গ. ৮/১০ ঘ. ১০/১২

২। দেহের কোষগুলো কর্মক্ষমতা হারায়-

i ফুটবল খেলার ফলে

ii গাড়ি চালানোর ফলে

iii গাড়িতে বসে গান শোনার ফলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রাজু একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বল নিয়ে মাঠে চলে গেল। কিন্তু মাঠে কোনো খেলোয়াড়কে না পেয়ে সে একাকী এক ঘণ্টা অবিরাম দৌড়াদৌড়ি করল। অতঃপর বাসায় এসে হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা করল।

৩। রাজু যে ব্যায়ামটি করল তা কোন ধরনের?

ক. পরিমিত ব্যায়াম খ. অনিয়মিত ব্যায়াম

গ. নিয়মতান্ত্রিক ব্যায়াম ঘ. সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম

৪. নিয়মিত এ ধরনের ব্যায়াম সরঞ্জামসহ করলে রাজুর কোনটি ঘটতে পারে?

ক. সুঅভ্যাস গড়ে উঠবে খ. হৃৎপিণ্ড সতেজ হবে

গ. হজমশক্তি বৃদ্ধি পাবে ঘ. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতি হবে

৫। সময়োপযোগী পোশাক পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেহকে-

i. আরামদায়ক করা

ii. আবহাওয়া উপযোগী করা

iii. জীবাণুমুক্ত করা

২০২৩

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬। শিশুদের দৈনিক কত মিনিট ব্যায়াম করা উচিত?

ক. ১০ খ. ২০

গ. ২৫ ঘ. ৩৫

৭। কোনটি সরঞ্জামবিহীন ব্যায়াম

ক. স্কিপিং রোপ খ. ফ্রিজবি

গ. হেডস্ট্যান্ড ঘ. রোমান রিং

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র-৩

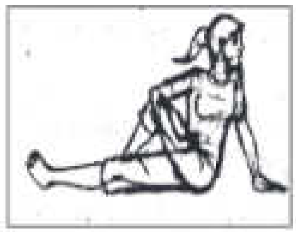
চিত্র-৪

৮. উপরে উল্লেখিত কোন ব্যায়াম বা খেলার ফলে কব্জির শক্তি বৃদ্ধি পাবে?

ক. চিত্র-১ খ. চিত্র-২

গ. চিত্র-৩ ঘ. চিত্র-৪

৯. চিত্র-১ এ অর্জিত যোগ্যতা নিচের কোন খেলায় অর্জন করা যায়?

ক. হ্যান্ডবল খ. ভলিবল

গ. ক্রিকেট ঘ. বাস্কেটবল

১০. ওয়ার্ম আপ না করে ব্যায়াম করলে কি সমস্যা হতে পারে?

ক. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে খ. শরীর ক্লান্ত হয়ে যেতে পারে

গ. মাংশপেশিতে টান পড়তে পারে ঘ. অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং

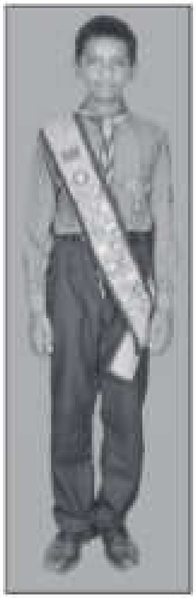

স্কাউট ও গার্ল গাইড বিশ্বব্যাপী একটি অরাজনৈতিক সমাজসেবামূলক যুব আন্দোলন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর তৎকালীন লেফটেন্যান্ট জেনারেল রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ১৯০৭ সালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং এবং ১৯১০ সালে গার্ল গাইডের ধারণা প্রবর্তন করেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং কার্যক্রম আরম্ভ করার আগে স্কাউটিংয়ে অংশ নিতে পারে, এমন বয়সের ছেলেমেয়েদের চাহিদা বিবেচনা করে তিনি কিছু বই প্রকাশ করেন। তার মধ্যে স্কাউট শাখার জন্য ১৯০৮ সালে 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' এবং গার্ল গাইড আন্দোলনের জন্য 'গার্ল গাইডিং' ও 'দি ব্লু বার্ড বুক' অন্যতম। আন্তর্জাতিক স্কাউট আন্দোলনের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশেও বাংলাদেশ স্কাউটস ও গার্ল গাইডের কর্মকাণ্ডের সূচনা হয়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং-এর কার্যক্রম শুরু হয়। দুঃস্থ মানবতার সেবা, নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন, সুসমন্বিত শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, ধর্মীয় সহনশীলতা প্রভৃতি গুণাবলি অর্জনের সহায়ক শক্তি হিসেবে স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং আন্দোলন বিশ্বব্যাপী প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশও এই কার্যক্রমে গর্বিত অংশীদার হিসেবে ইতোমধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

১। স্কাউটিং কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন ব্যাজ অর্জনসহ স্কাউট ও গার্ল গাইডিং-এর অন্যান্য কর্মসূচির ব্যাখ্যা করতে পারব।

২। স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং-এর মাধ্যমে সুশৃংখল জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হব।

৩। প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োগ সম্পর্কে জানব এবং যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারব।

৪। দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসার সেবা প্রয়োগ করতে পারব।

পাঠ–১ : স্কাউট ও গার্ল গাইডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কর্মসূচি

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ছিলেন স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৮৫৭ সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। স্কাউটিং পদ্ধতিতে ইংল্যান্ডের বালকদের চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলির উন্নতি দেখে তিনি সারা বিশ্বে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেন। ১৯২০ সালে বিশ্ব স্কাউট সংস্থা গঠিত হয়। বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রধান কার্যালয় সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় অবস্থিত। স্কাউট একজন বিশ্বজনীন অরাজনৈতিক সমাজসেবামূলক যুব আন্দোলন। স্কাউট আন্দোলনের লক্ষ্যই হচ্ছে একটি স্কাউটকে চরিত্রবান করে আদর্শ মানুষে রূপান্তরিত করা। স্কাউটিং কার্যক্রম বালকদের আত্মনির্ভর ও সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে সহায়তা করে। ভারত বিভাগের পর

১৯৪৮ সালে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ স্কাউট সমিতি গঠন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশের স্কাউট আন্দোলন এক নতুন রূপ নেয়। ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল ঢাকায় দেশের স্কাউট নেতাদের এক সাধারণ সভায় বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি গঠিত হয়। ১৯৭৪ সালের ১ জুন বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতিকে বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে ১০৫তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৮ সালের ১৮ জুন ৫ম কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতির নাম বদল করে 'বাংলাদেশ স্কাউট' রাখা হয়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার কাকরাইলে এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। জেলা শহর গাজীপুরের অদূরে মৌচাকে স্কাউটের জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অবস্থিত।

রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল গার্ল গাইডেরও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি স্কাউটের অনুরূপ মেয়েদের জন্যও আলাদা কর্মসূচি দিয়ে নাম দিলেন গাইডিং। অতঃপর এই আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তার বোন এগনেসকে দায়িত্ব প্রদান করেন। এগনেস তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

গাইডিং মেয়েদেরকে

ক) ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে।
খ) সামাজিক চেতনাবোধ বৃদ্ধি করে।
গ) দায়িত্বশীল নাগরিক হবার শিক্ষা দেয়।
ঘ) সেবামূলক কাজ করার শিক্ষা দেয়।
ঙ) বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যুব সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদ গার্ল গাইড অ্যাসোসিয়েশনকে একটি জাতীয় সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আইন পাশ করে। ১৯৭৩ সালে এই সংগঠন বিশ্ব গার্ল গাইড এ্যাসোসিয়েশনের পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডে গার্ল গাইডের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

কাজ–১ : স্কাউট ও গার্ল গাইড সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা দেবেন।

পাঠ–২ : উপদল (পেট্রোল) ও ব্যাজ পদ্ধতি

স্কাউট ও গাইডদের সকল কাজ উপদল (পেট্রোল) পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এই পদ্ধতিতে ছয় থেকে আটজন স্কাউট ও গাইড নিয়ে একটি উপদল গঠিত হয়। উপদল কার্যক্রম পরিচালনা, উপদল পতাকা বহন ও উপদল

সদস্যদের বিভিন্ন কাজে সাহায্যের জন্য প্রত্যেক উপদল থেকে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নেতৃত্বদানে সক্ষম স্কাউট/গাইডকে নিয়ম মোতাবেক উপদল নেতা নিয়োগ করা হয়। উপদলের অন্য সদস্যদের বিভিন্ন দায়িত্ব থাকে। প্রত্যেক উপদলের আলাদা নাম, চিহ্ন, পরিচয়ের ডাক এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্থান থাকে। উপদলের বিভিন্ন কার্যাবলি পরিচালনার সুবিধার জন্য সবার নাম ঠিকানা এবং অন্যান্য পরিচিতি মনে রাখতে হয়। মনে রাখার সুবিধার জন্য ডাইরি বা নোট বুকে সবার নাম-ঠিকানা লিখে রাখতে হয়।

উপদল পদ্ধতি ছেলেমেয়েদের সচেতন করার জন্য সবচেয়ে উত্তম পন্থা। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল সর্বপ্রথম ভারতে এ পদ্ধতি চালু করেন। তারপর এই পদ্ধতি পৃথিবীর সব স্কাউট ও গাইড দলের মধ্যে প্রচলন করা হয়। উপদল পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ছেলেমেয়েদেরকে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি ছেলেমেয়ে বুঝতে পারে, তার উপদলের উন্নতির জন্য তার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। উপদল পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি স্কাউট ও গাইড কোম্পানি পর্যন্ত তার মতামত পৌঁছাতে পারে এবং তারা তাদের নিজ উপদলের (পেট্রোলের) সুবিধা অনুযায়ী কোম্পানির কার্যক্রম, পরিকল্পনা ইত্যাদি বাস্তবায়িত করতে পারে। এ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে প্রতিটি স্কাউট ও গাইড আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে এবং নিজ পরিবার ও সমাজ সম্পর্কে দায়িত্বশীল হয়।

উপদল পতাকা

উপদল পতাকা : উপদল পতাকা ত্রিকোণাকার সাদা জমিনবিশিষ্ট হবে। পতাকার মাঝখানে উপদলের নামের প্রাণি/পাখির মুখমণ্ডল আঁকা থাকবে। উপদলের পতাকাদণ্ড স্কাউট লাঠির সমান। উপদল পতাকার পরিমাপ হবে ৩০ সেন্টিমিটার × ২০ সেন্টিমিটার।

টেন্ডারফুট ব্যাজ : এই ব্যাজের মোট চারটি রং সবুজ, হলুদ, লাল ও সাদা।

টেন্ডারফুট ব্যাজ

সবুজ : আমাদের দেশের জাতীয় পতাকার রং থেকে নেওয়া হয়েছে। এই রং-এর অর্থ তারুণ্যের উদ্দীপনা, সজীবতা। এই রং আমাদের চারিপাশে গাছপালার মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

হলুদ রং : সোনালি আঁশ থেকে নেওয়া হয়েছে।

লাল : রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে যে নতুন সূর্যের উদয় হয়েছে এটা তার প্রতীক।

চারটি সাদা স্তবক : এর অর্থ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের চারটি মূলনীতি। বুদ্ধি, হাতের কাজ, স্বাস্থ্য ও সেবা। সাদা রং এর অর্থ পবিত্র, নির্মল ও ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন। গাইডও এই রং-এর মত পবিত্র, নির্মল ও একে অপরের ভগ্নি।

ত্রিপত্র : তিনটি পাপড়ি হলুদ রং-এর অর্থ গাইড প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশ।

ডাটা : এর অর্থ একতাবদ্ধভাবে কাজ করা।

ঢেউ : স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা।

শাড়িতে যদি ব্যাজ লাগানো অসুবিধা হয় তা হলে ব্লাউজের কলারে বাম দিকে ব্যাজ লাগানো যায়।

এই ব্যাজের উপর অন্য কোন ব্যাজ লাগানো যাবে না। যেহেতু কষ্ট করে এই ব্যাজ অর্জন করা হয় সেহেতু অন্য ব্যাজগুলি টেন্ডারফুট ব্যাজের নিচে লাগানো যাবে। টেন্ডার ফুট ব্যাজকে প্রতিজ্ঞা (promise) ব্যাজ বলে।

টেন্ডারফুট পরীক্ষায় পাশ করার পর এবং দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার পর ফুল ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় শুধুমাত্র এই ব্যাজ পরা যায়। এই ব্যাজ বাম দিকে পরতে হয়। যদি টাই থাকে তবে টাইয়ের মাঝখানে ব্যাজ পরতে হয়।

ক) দক্ষতা ব্যাজ ও গাইড নৈপুণ্যসূচক ব্যাজ : দক্ষতা ব্যাজ প্রদান করা হয় নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট পাঠক্রমের উপর দক্ষতা অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ। দক্ষতা ব্যাজ হলো চারটি-

(১) সদস্য ব্যাজ (২) স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ (৩) প্রোগ্রেস ব্যাজ ও (৪) সার্ভিস ব্যাজ।

(১) সদস্য ব্যাজ স্কাউট শার্টের বাম পকেটের মাঝখানে সেলাই করে পরতে হয়।

(২) স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ শার্টের বাম হাতার ভাঁজের ওপর কনুই ও কাঁধের মাঝখানে সেলাই করে পরতে হয়।

(৩) প্রোগ্রেস ব্যাজ স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজের স্থলে লাগাতে হয়।

(৪) সার্ভিস ব্যাজ প্রোগ্রেস ব্যাজ সরিয়ে তার স্থানে সেলাই করে পরতে হয়।

গাইড নৈপুণ্যসূচক ব্যাজ :

১. রাঁধুনী	২. ঘর কন্যা	৩. প্রাথমিক চিকিৎসা	৪. মালিনী
৫. স্বাস্থ্য প্রতীক	৬. গৃহিনিপনা	৭. অতিথি সেবিকা	৮. বুনন প্রতীক
৯. রজকী	১০. সূচি শিল্পী	১১.হাঁস-মুরগি পালন	১২.শুশ্রূষাকারী
১৩. সেলাই	১৪. কৃষি	১৫.স্যানিটেশন	

১৬. ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি (ও আর টি)

খ) পারদর্শিতা ব্যাজ : বিভিন্ন বিষয়ের উপর পারদর্শিতা অর্জনের স্বীকৃতি প্রদানের নিদর্শন হলো পারদর্শিতা ব্যাজ। বর্তমানে বিশেষ তিনটি ব্যাজ গ্রুপসহ মোট ১৩টি গ্রুপে পারদর্শিতা ব্যাজের সংখ্যা ১২৬টি। পারদর্শিতা ব্যাজ স্কাউট শার্টের ডান হাতের কনুই ও কাঁধের মাঝে সেলাই করে পরতে হয়।

কাজ-১ :	ব্যাজ পদ্ধতির নামগুলো পোস্টারে প্রদর্শন কর।
কাজ-২ :	কোন ব্যাজ কোথায় পরতে হয় তা অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ-৩ : পাইওনিয়ারিং, ল্যাশিং ও টেন্ডারফুট গিরা

ক) পাইওনিয়ারিং: স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং-এ হাইকিং করার সময় তাঁবুবাসকালে দড়ির বিভিন্ন গেরো সম্পর্কে জানা ও বাস্তবে প্রয়োগ করাকে পাইওনিয়ারিং বলে। যেমন-

১) দড়ির বিভিন্ন অংশের নাম জানা ও চিহ্নিত করতে পারা।

২) দড়ির সাহায্যেও নিম্নলিখিত গেরোগুলো বাঁধতে এবং এগুলোর সঠিক ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারবে। যেমন: বোলাইন অন দি বাইট, ক্যাটস প, ডবল শিটবেন্ড, ক্রিপারি শিটবেন্ড, ফায়ার ম্যান চেয়ার নট ইত্যাদি।

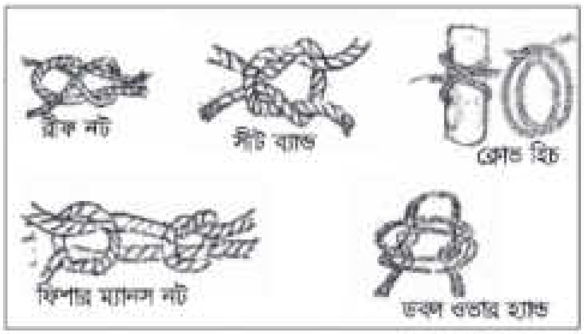

টেন্ডারফুট গিরা

৩) সঠিক প্যাচের সাহায্যে চারটি লাঠি দিয়ে একটা পতাকা দন্ড তৈরি করতে পারা।

৪) সঠিক প্যাচের সাহায্যে একটা শিয়ার লেগ তৈরি করতে পারা।

গ্যাজেট : তাঁবুতে বসবাসের জন্য গাছের ডাল বা বাঁশ দিয়ে তৈরি আসবাবপত্র রাখার ব্যবস্থাকে গ্যাজেট বলে।

খ) ল্যাশিং : দু-তিনটা বাঁশ বা কাঠকে একত্রে বাঁধার জন্য দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধাকে ল্যাশিং বলে। সাধারনত পুল, ঘর, মাচা, গ্যাজেট তৈরি ও গাছে ঠেকা দেওয়ার সময় ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। ল্যাশিং

২০১৫

অনেক প্রকার থাকলেও স্কাউটদের প্রাথমিক পর্যায়ে চার প্রকার ল্যাশিংয়ের প্রয়োজন হয়। যথা -

১। স্কোয়ার ল্যাশিং (Square Lashing)।

২। ডায়াগোনাল ল্যাশিং (Diagonal Lashing)।

৩। পোল এণ্ড শিয়ার ল্যাশিং (Pole and Sheer Lashing)।

৪। ফিগার অব এইট ল্যাশিং (Figure of Eight Lashing)।

স্কোয়ার ল্যাশিং (Square Lashing) : একটি বাঁশের উপর আরেকটি বাঁশ আড়াআড়িভাবে রেখে শক্ত করে বাঁধার জন্য যে পেঁচ দেওয়া হয়, তাকে স্কোয়ার ল্যাশিং বলে। একটি বাঁশ মাটির ওপর খাড়াভাবে রেখে অপর একটি বাঁশের টুকরা ঐ বাঁশের উপর আড়াআড়ি রাখতে হবে। যে বাঁশটি খাড়াভাবে আছে, সেটি হচ্ছে পোল এবং যে বাঁশটি আড়াআড়িভাবে রাখা হয়েছে, সেটি হচ্ছে বার। এবার পোল এবং বার যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখানে একটি বড়শি গেরো দিয়ে ঐ দড়ির চলমান অংশকে বারের উপর দিয়ে পোলকে পেছন দিক থেকে পেঁচিয়ে আবার বারের উপর রাখতে হবে। এভাবে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে ৮/১০ বার পোল এবং বারকে জড়িয়ে পেঁচ দিতে হবে। পোল পেঁচানোর সময় দড়ি পোলের নিচে এবং উপরের প্রথমে যে দুটি পেঁচ দেওয়া হয়েছিল, পরবর্তী পেঁচগুলো দুটির মধ্যে দিতে হবে। যাতে আস্তে আস্তে পোলের এই অংশের ফাঁক বন্ধ হয়ে যায়। পোল এবং বার ৮/১০ বার পেঁচানো শেষ হলে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে পোল এবং বারের মাঝে যে দড়ি আছে, তাকে শক্ত করে অন্ততপক্ষে ৩/৪ বার পেঁচাতে হবে। এই পেঁচানোকে ফ্রাপিং (Frapping) বলে।

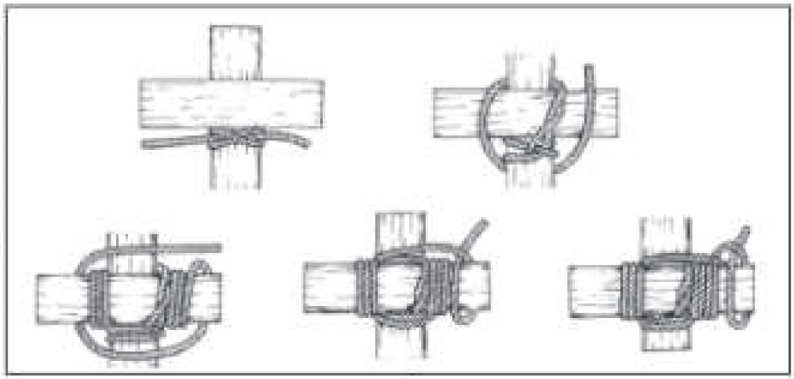

স্কোয়ার ল্যাশিং

ফ্রাপিং যত শক্ত হবে, ল্যাশিং তত মজবুত হবে। ফ্রাপিং দেওয়া শেষ হলে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে বারে বড়শি গেরো দিয়ে বেঁধে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। এভাবে স্কোয়ার ল্যাশিং বাঁধতে হয়।

ডায়াগোনাল ল্যাশিং (Diagonal Lashing) : একটি দণ্ডকে অপর একটি দণ্ডের উপর কোনাকুনিভাবে বা গুণন চিহ্নের (×) মতো অবস্থায় রাখতে হবে। এভাবে রাখার ফলে দুটি দণ্ড যেখানে একত্রিত হয়েছে, সেখানে একটি গাড়ি টানা গেরো দিতে হবে। দড়ির চলমান অংশের দিক পরিবর্তন করে বাইরের দিক দিয়ে

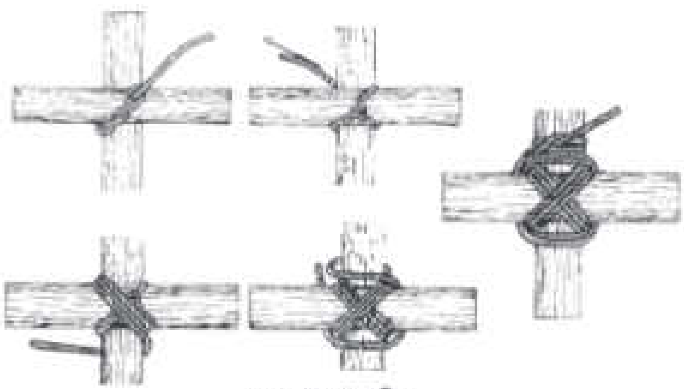

ডায়াগোনাল ল্যাশিং

দুই দণ্ডকে একত্রে ৫/৭ বার পেঁচাতে হবে। এরপর যে দিক থেকে আগে পেঁচানো হয়েছে তার বিপরীত দিক থেকে দুই দণ্ডকে একত্রিত করে আগের মতো ৫/৭ বার পেঁচ দিতে হবে। এভাবে দুই দিক দিয়ে পেঁচানো শেষ হলে দণ্ডের মাঝে দড়ির যে অংশ আছে, তাকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে শক্ত করে অন্ততপক্ষে ৩/৪ বার পেঁচ দিতে হবে। এই পেঁচ যত শক্ত হবে ল্যাশিং তত মজবুত হবে। ফ্রাপিং দেওয়া শেষ হলে যেকোনো একটি দণ্ডের সাথে দড়ির চলমান অংশের দ্বারা বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। এভাবে ডায়াগোনাল ল্যাশিং বাঁধতে হয়।

কাজ–১ : স্কোয়ার ল্যাশিং ও ডায়াগোনাল ল্যাশিং বেঁধে প্রদর্শন কর।

পাঠ–৪ : পোল অ্যান্ড শিয়ার ও ফিগার অব এইট ল্যাশিং

পোল অ্যান্ড শিয়ার ল্যাশিং (Pole and Shear Lashing) : পোল অ্যান্ড শিয়ার ল্যাশিংকে অনেকে শুধু শিয়ার ল্যাশিং বলে। দুটি বাঁশ বা কাঠকে একত্রে বাঁধার জন্য যে পেঁচ দেওয়া হয়, তাকে পোল অ্যান্ড শিয়ার ল্যাশিং বলে। দুটি বাঁশ বা দণ্ডকে একত্রে বেঁধে তাকে পায়া হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অথবা একটি বাঁশ বা দণ্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দণ্ডের সাথে বেঁধে তাকে লম্বা করার জন্য এই ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। যখন দুটি বাঁশ বা দণ্ডকে মাথার দিকে একত্রে বেঁধে তাকে পায়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন তাকে শিয়ার লেগ বলে। যখন একটি বাঁশ বা দণ্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দণ্ডের সাথে একত্রে বেঁধে লম্বা করা হয় তখন তাকে পোল বলে। মুলত শিয়ার লেগ এবং পোল তৈরির জন্য একই ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। শিয়ার লেগ ও পোল করার জন্য একই ল্যাশিং ব্যবহার করা হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন– শিয়ার লেগ তৈরির জন্য ফ্রাপিং দিতে হয়। আর পোল তৈরির জন্য ফ্রাপিং দিতে হয় না। কীভাবে পোল তৈরি ও শিয়ার লেগ তৈরি করা হয় তা নিম্নে পৃথকভাবে দেওয়া হলো–

পোল তৈরি : একটি দণ্ডের মাথায় ২০ সে:মি: নিচে অপর একটি দণ্ডের নিচের অংশ রেখে দণ্ডকে আগের দণ্ডের পাশাপাশি রেখে নিচে রাখা দণ্ডটি, যেখানে ওপরের দণ্ডের সাথে মিলিত হয়েছে, তার ৪/৫ সে:মি: ওপরে দুটি দণ্ডকে একত্রিত করে সেখানে দড়ির স্থির অংশ দিয়ে বড়শি গেরো বাঁধতে হবে। বড়শি গেরো বাঁধার পর দড়ির স্থিরপ্রান্তের যে বাড়তি অংশ থেকে যাবে, তাকে দড়ির চলমান অংশের সাথে পেঁচিয়ে দিতে হবে। তারপর চলমান অংশ দিয়ে দুটি দণ্ড একত্র করে নিচের দিক থেকে উপরের দিকে পেঁচ দিতে হবে। ৮/১০ বার পেঁচ দেওয়া হয়ে গেলে দণ্ডকে একত্র করে বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। দুটি দণ্ড যেখানে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে, সেখানে আলাদা আলাদা ল্যাশিং দিলে সুবিধা হয় এবং বাঁধন খুব শক্ত হয়। দণ্ড কোনো দিকে হেলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে পোল তৈরির জন্য পোল ল্যাশিং বাঁধতে হয়।

পোল তৈরি

শিয়ার লেগ তৈরি : দুটি বাঁশ বা দণ্ডের নিচের অংশ সমান্তরাল রেখায় রেখে দুটি দণ্ডকে একত্র করে ওপরের যেকোনো দণ্ডে দড়ির স্থির প্রান্ত দিয়ে একটি বড়শি গেরো দিতে হবে। বড়শি গেরো দেওয়ার পর দড়ির স্থিরপ্রান্তের বাড়তি অংশ থেকে যাবে, তাকে দড়ির চলমান অংশের সাথে পেঁচিয়ে নিতে হবে। এবার দড়ির চলমান অংশ দিয়ে দুটি দণ্ডকে একত্র করে পেঁচিয়ে নিচ থেকে ওপরের দিকে যেতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যে দুটি দণ্ডের সাথে পেঁচ দেওয়ার সময় একটি দড়ির সাথে যেন আরেকটি দড়ি লেগে থাকে। একটি দড়ি যেন আর একটি দড়ির উপর না ওঠে। ৮/১০ বার পেঁচ দেওয়া শেষ হলে দুই দণ্ডের মাঝখানে দড়ির যে অংশ আছে, তাকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে শক্ত করে অন্তত পক্ষে ৪/৫ বার পেঁচ দিতে হবে। দুই দণ্ডের মাঝখানের দড়িকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে পেঁচানোকে ফ্রাপিং (Frapping) বলে। ফ্রাপিং যত মজবুত হবে ল্যাশিং তত শক্ত হবে। ফ্রাপিং দেওয়া শেষ হলে প্রথমে যে দণ্ডে বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শুরু করেছিল তার বিপরীত দণ্ডে বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। এভাবে শিয়ার লেগ তৈরি করা হয়।

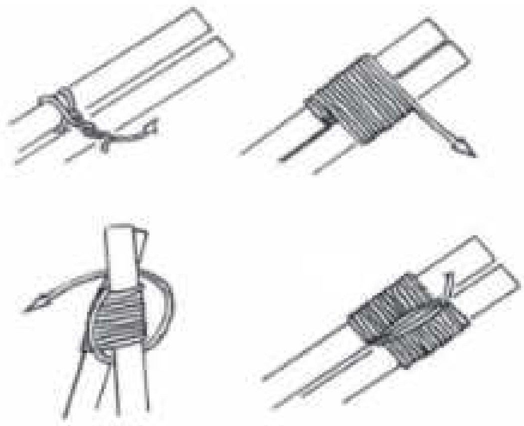

শিয়ার লেগ

ফিগার অব এইট ল্যাশিং (Figure of Eight Lashing) : তিনটি দণ্ডের নিচের অংশকে একই সমান্তরাল রেখায় রেখে দণ্ড তিনটিকে একটির পাশে আর একটি রাখতে হবে। দণ্ড তিনটি খুব কাছাকাছি থাকবে। যেকোনো দুটি দণ্ডকে বড়শি গেরো দিয়ে বাঁধতে হবে। বড়শি গেরোর মাথা যেন দণ্ডের উপর থাকে। বড়শি গেরো বাঁধার পর দড়ির স্থির প্রান্তের যে বাড়তি অংশ থেকে যাবে, তাকে দড়ির চলমান অংশকে একটি দণ্ড বাদ দিয়ে পরবর্তী দণ্ডকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নিচ থেকে উপরের দিকে যেতে হবে। কমপক্ষে ৫/৭ বার দড়ি পেঁচানো শেষ হলে যে দণ্ডের সাথে প্রথম বড়শি গেরো বাঁধা হয়েছিল সে দণ্ডের পার্শ্ববর্তী দণ্ডের মাঝখানে দড়ির যে অংশ আছে সে দড়িকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে প্রথমে কমপক্ষে তিনবার পেঁচ দিতে হবে।

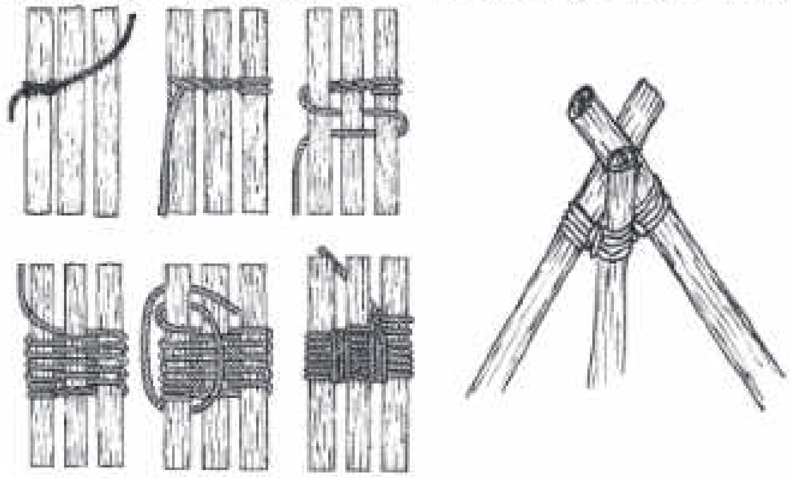

ফিগার অব এইট ল্যাশিং

১০৩৫

পরবর্তীতে পাশের দুই দন্ডের মাঝখানে দড়ির যে অংশ আছে তাকে আবার আগের মতো করে পেঁচ দিতে হবে। এভাবে দড়ির উপর দড়ি দিয়ে পেঁচ দেওয়াকে ফ্রাপিং বলে। ফ্রাপিং যত শক্ত হবে, ল্যাশিং তত মজবুত হবে। ফ্রাপিং দেওয়া শেষ হলে বড়শি গেরো দিয়ে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। তিনটি দণ্ড বা বাঁশকে একত্রে বেঁধে ট্রিপট তৈরি করার জন্য ফিগার অব এইট ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়।

কাজ–১ : পোল অ্যান্ড শিয়ার ল্যাশিং ও ফিগার অব এইট ল্যাশিং তৈরি করে দেখাও।

পাঠ–৫ : প্রাথমিক চিকিৎসা/প্রতিবিধান

প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জানার আগে প্রাথমিক চিকিৎসা কী তা তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে ধারণা পেয়েছো। প্রাথমিক চিকিৎসা বা প্রতিবিধান চিকিৎসাশাস্ত্রের একটি অংশ। প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে হঠাৎ কোনো পীড়া বা দৈব দুর্ঘটনায় হাতের কাছের জিনিসের দ্বারা রোগীকে প্রাথমিকভাবে সাহায্য করা, যাতে ডাক্তার আসার আগে রোগীর অবস্থার অবনতি না ঘটে বা জটিলতা সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ যেকোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রথম শুশ্রূষা এবং সংক্ষিপ্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা / প্রতিবিধান বলা হয়।

রক্তক্ষরণ : রক্ত হলো এক প্রকার তরল পদার্থ। এর রং লাল। হিমোগ্লোবিন নামক লাল রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতিতে রক্তের রং লাল দেখায়। শরীরের কোনো স্থানে আঘাতের ফলে বা কেটে গেলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, এবং সেই ক্ষত হতে যে রক্ত বের হয়, তাকে রক্তক্ষরণ বা রক্তপাত বলে। বিভিন্নভাবে রক্তক্ষরণ হতে পারে যেমন–

১। মুখ দিয়ে রক্ত পড়া : মুখের ভিতরের যেকোনো অংশ থেকে রক্তপাত হলে বরফ চুষতে হবে। তাহলে রক্তপাত বন্ধ হবে। এরপর রোগীকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে হবে।

২। নাক দিয়ে রক্ত পড়া : আঘাতজনিত বা অন্য কোনো কারণে কারো নাক দিয়ে রক্ত পড়তে শুরু করলে তৎক্ষণাৎ তাকে চিত করে শোয়াতে হবে অথবা বসিয়ে মাথা পেছনের দিকে হেলিয়ে রাখতে হবে। কাপড়চোপড় ঢিলা করে দিতে হবে। নাকের সামনে ও ঘাড়ের পিছনে ঠান্ডা কমপ্রেস দিতে হবে। তখন মুখ দিয়ে শ্বাসকার্য চালাতে হবে। রক্তপাত বন্ধ হবার পরও কিছুক্ষণ নাকের ছিদ্রপথে তুলো দিয়ে রাখতে হবে।

৩। শরীরের কোনো অংশ কেটে গেলে: কাটা স্থানটি কিছুক্ষণ পরিষ্কার হাতে চেপে ধরতে হবে। রক্ত বন্ধ হলে ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। সাধারণত তিনটি উৎস থেকে রক্তপাত হয়। যথা–

ক) কৈশিক নালি (Capillary) –একটানা স্রোতের ন্যায় রক্ত বের হয়।

খ) শিরা (Vein) –গলগল করে রক্ত বের হয়।

গ) ধমনী (Artery) – ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়।

দুর্ঘটনায় বেশির ভাগ রক্তপাত হয় কৈশিক নালি থেকে।

রক্তপাতের প্রাথমিক চিকিৎসা :

১। রোগীকে বসানো ও শোয়ানো যায় এমন স্থানে স্থানান্তর করতে হবে। এতে রক্তপাত আপনা–আপনি কমে যাবে।

২। যে স্থান হতে রক্তপাত হচ্ছে, সে স্থান হৃৎপিণ্ডের সমতার উপর তুলে ধরলে রক্তপাত অনেকটা কমে যাবে।

৩। সামান্য কেটে গেলে ঐ স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে আপনা-আপনি রক্তপাত বন্ধ হয়।

৪। কাটা স্থানে বৃদ্ধাঙ্গুলির চাপ প্রয়োগ করলে অনেক সময় রক্তপাত বন্ধ হয়।

৫। আহত অঙ্গের নড়াচড়া বন্ধ করতে হবে।

৬। রক্তপাতের স্থানে বরফ ব্যবহার করতে হবে।

৭। রক্তপাত বন্ধের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ দিতে হবে।

৮। ক্ষতস্থান পরিষ্কার কাপড় বা ব্যান্ডেজ দিয়ে বাঁধতে হবে।

৯। তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে নিতে হবে।

১০। বেশি রক্তপাত হলে টুর্নিকেট ব্যবহার করতে হবে। টুর্নিকেট অর্থ হলো প্রাথমিক বাঁধনকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শক্ত করে তোলা। ক্ষতস্থান ঢিলা করে বেঁধে তার ভিতরে একটি কাঠি বা পেনসিল ঢুকিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরালে বাঁধনটি ক্রমশ শক্ত হয়ে রক্তপাত বন্ধ হয়।

বৈদ্যুতিক শক : আজকাল শহর ও শহরতলি এবং গ্রামেও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বহু জায়গায় অপরিকল্পিত ও অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার ফলে যেকোনো সময় তড়িতাহত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিদ্যুৎপ্রবাহ বা কারেন্ট দুই ধরনের। এসি (AC) কারেন্ট ও ডিসি (DC) কারেন্ট। এসি কারেন্ট আকর্ষণ করে টেনে নেয়। ডিসি কারেন্ট শুধু ধাক্কা দেয়। সে জন্য এসি কারেন্ট বেশি মারাত্মক। ভেজা কাপড় বা গাছের সাথে বিদ্যুৎপ্রবাহের সংযোগের ফলে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এগুলো স্পর্শ করলে নিজেও তড়িতাহত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে : কারো শরীরে বিদ্যুতের তার জড়িয়ে গেলে বা কেউ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে সাথে সাথে মেইন সুইচ বন্ধ করে দিতে হবে। কোনো কারণে সুইচ বন্ধ করতে না পারলে শুকনা কাঠ দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে ছাড়িয়ে দিতে হবে। কাঠ না পেলে শুকনা কাপড় হাতে জড়িয়ে ধাক্কা দিতে হবে। কখনো খালি হাতে ধরলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বিপদ ঘটতে পারে। কখনো গায়ে পানি দেবে না। শ্বাসক্রিয়া না চললে কৃত্রিমভাবে শ্বাসকার্য চালাতে হবে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখাতে হবে।

মচকানো : হাড়ের সংযোগ স্থান সঞ্চালনের সময় হঠাৎ মচকে গেলে বা বেঁকে গেলে সংযোগ স্থান সংলগ্ন স্নায়ুতন্ত্রের ওপর টান পড়ে বা ছিঁড়ে গিয়ে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাকে মচকানো বলে। ব্যায়াম, খেলাধুলা বা অন্যান্য কাজকর্মের সময় মাঝে মাঝে ব্যথা পাওয়া বা মচকানো অস্বাভাবিক নয়। এসব দুর্ঘটনার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু অনেক সময় চিকিৎসকের সাহায্য পেতে দেরি হয়। তাই আহত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসার দরকার হয়।

লক্ষণ :

১। আহত স্থানে ব্যথা অনুভূত হবে।

২। সন্ধিস্থল ফুলে যাবে।

৩। আহত স্থান বিবর্ণ হয়ে নীল বা লাল আকার ধারণ করবে।

৪। স্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করা যাবে না এবং চলার সময় আহত স্থানে ব্যথা বৃদ্ধি পাবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা :

১। আঘাতের সাথে সাথে আহত স্থানে ঠান্ডা পানি বা বরফ লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

২। আহত স্থানটি নড়াচড়া করতে দেওয়া যাবে না।

৩। মচকানো স্থানটি যথাসম্ভব আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হবে।

৪। আহত স্থানে হাড়ভাঙার ব্যান্ডেজ প্রয়োগ করতে হবে।

৫। ব্যান্ডেজ সব সময় ভিজা রাখবে। সম্ভব হলে বরফ লাগাবে।

৬। মাংসপেশি মচকে গেলে রোগীকে সহজ ও আরামদায়ক অবস্থায় শোয়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে ডাক্তার বা হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কামড়, দংশন বা হুল ফোটা : বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের কামড় থেকে সাবধান থাকতে হবে। পাগলা কুকুরের মুখের লালায় জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু থাকে। কুকুর, নেকড়ে, শিয়াল, বেজি ও ছুঁচো-এরা সবাই জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু বহন করে। এরা কামড়ালে সাথে সাথে আহত স্থানে কার্বলিক সাবান বা পানি দিয়ে আহত স্থানটি ভালোভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিড়ালের নখ খুব তীক্ষ্ণ। বিড়াল থেকে ডিপথেরিয়া রোগ হয়। বিছা, মৌমাছি ও ভীমরুলের কামড় মারাত্মক। এরা হুল ফুটিয়ে বিষ থলি থেকে হুলের পথে বিষ ঢেলে দেয়। অনেক সময় হুলটি ভেঙে গিয়ে দংশন স্থানে লেগে থাকে। যদি হুল ফুটে থাকে তবে ক্ষতের চারদিকে চাপ দিয়ে হুলটি বের করে নিতে হবে।

সাপে কামড়ালে কামড়ের জায়গার উপরে কাপড় বা দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধতে হবে। এর ফলে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হবে এবং বিষ ছড়াতে পারবে না। ধারালো ব্লেড দিয়ে আহত জায়গা একটু গভীর করে কেটে (আধা সে: মি:) রক্ত বের করে ফেলতে হবে। ৩০ মিনিটের বেশি সময় বেঁধে রাখা যাবে না। বেশি সময় বেঁধে রাখলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে নিচের অংশে পচন ধরতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের নিকট বা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

চোখে কিছু পড়লে : চোখ মানুষের অমূল্য সম্পদ। নানা কারণে চোখ দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে। চোখে ধুলোবালি পড়তে পারে। কাজ করার সময় কিছু ছিটকে এসে চোখে বিঁধতে পারে, কোনো রাসায়নিক পদার্থ চোখে পড়তে পারে। এরূপ কিছু চোখে পড়ে গেলে -

১। কখনই চোখ কচলানো যাবে না।

২। চোখে পানির ঝাপটা দিতে হবে।

৩। রোগীকে আলোর দিকে মুখ করে বসিয়ে আলতোভাবে চোখের দুটি পাতা খুলে দেখতে হবে। চোখে কোনো বস্তু লেগে থাকলে রুমালের কোনা ভিজিয়ে আলতোভাবে ব্রাশ করার মতো লাগিয়ে বস্তুটি তুলে নিতে হবে।

৪। রাসায়নিক কিছু চোখে পড়লে দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

৫। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বা হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

কানে কিছু গেলে : কানে পোকামাকড় ঢুকে গেলে সরিষার তেল বা অলিভ ওয়েল অল্প পরিমাণ ঢেলে দিলে পোকা মরে যায় এবং বের হয়ে আসে। তাছাড়া মার্বেল জাতীয় কোনো কিছু ঢুকে গেলে নড়াচড়া না করে দ্রুত ডাক্তারের নিকট বা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

অজ্ঞান অবস্থায় করণীয় : দেহের স্নায়ুতন্ত্রের কাজের বিঘ্ন ঘটলে রোগীর জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। এ অবস্থাকে অজ্ঞান বা অচেতন অবস্থা বলে। বিভিন্ন কারণে মানুষ অজ্ঞান হয় যেমন- রোগবশত, দুর্ঘটনাজনিত, বিষক্রিয়াজনিত এবং তাপের তারতম্যজনিত কারণে। এ অবস্থায় প্রাথমিকভাবে যা করতে হবে-

১। রোগীকে ফাঁকা ও বায়ুপূর্ণ স্থানে নিয়ে যেতে হবে।

২। রোগীর জামা-কাপড়, জুতা, মোজা, কৃত্রিম দাঁত থাকলে খুলে নিতে হবে।

৩। রোগীকে চিৎ করে শুইয়ে পর্যবেক্ষণ করে কী করণীয় তা স্থির করতে হবে।

৪। লোক বেশি হলে সরাতে হবে।

৫। রক্তক্ষরণ হলে তার প্রতিবিধান করতে হবে।

৬। কোনো উত্তেজক পানীয় বা খাদ্য খাওয়ানো যাবে না।

৭। বিষজনিত কারণে অজ্ঞান হলে রোগীকে উপুড় করে বুকের নিচে বালিশ দিয়ে শুইয়ে দিতে হবে। রোগীর দুটি পা হাঁটু হতে উপরের দিকে ভাঁজ করে দিতে হবে।

৮। জ্ঞান ফেরার জন্য মুখে পানির ঝাপটা দিতে হবে। গরম চা বা কফি খাওয়াতে হবে।

৯। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

কাজ–১: বাড়িতে, বাড়ির বাইরে, খেলার মাঠে ঘটতে পারে এমন কয়েকটি দুর্ঘটনার নাম উল্লেখ কর।

কাজ–২: খেলার মাঠে আঘাত পেয়ে নাক দিয়ে রক্ত পড়লে প্রাথমিক চিকিৎসা কীভাবে দেওয়া হয় তা বর্ণনা কর।

কাজ–৩ : গত তিন মাসে তোমাদের বাড়িতে কেউ দুর্ঘটনায় পড়েছিল কি না তা নিচের ছকে পূরণ কর (দলগত কাজ)

পরিবারের সদস্য	দুর্ঘটনার ধরন
১। মা	
২। বাবা	
৩। বোন	
৪। ভাই	
৫। গৃহকর্মী	

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'দি ব্লু বার্ড বুক' বইটি কাদের জন্য লেখা?

ক. হলদে পাখি খ. গার্ল গাইড
গ. বয়েজ স্কাউট ঘ. রোভার স্কাউট

২. বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রধান কার্যালয় কোথায়?

ক. লন্ডন খ. জেনেভা
গ. ঢাকা ঘ. নয়াদিল্লি

৩. গার্ল গাইডের প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক. লর্ড ব্যাডেন পাওয়াল খ. লেডি ব্যাডেন পাওয়াল
গ. এগনেস ঘ. হেনরী ডোনান্ট

২০১৫

৪. উপদল পদ্ধতির সুবিধা–

i. কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হয়

ii. স্কাউট স্তর চিহ্নিত করা যায়

iii. সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫। উপদল পতাকায় পাট কোন রং নির্দেশ করে?

ক. সবুজ খ. হলুদ গ. লাল ঘ. সাদা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

এস. আর বিদ্যালয়ের স্কাউট গ্রুপের ছাত্ররা বার্ষিক তাবুঁবাস, জাম্বুরি ও সকল স্কাউট কার্যক্রমে অংশ নেয়। প্রতি বছরই তারা বিভিন্ন পর্যায়ে পুরস্কার লাভ করে। তবে জি. এম বিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্কাউট কার্যক্রমে নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু এস. আর বিদ্যালয়ের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে জি. এম বিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্কাউট কার্যক্রমে সক্রিয় হয়ে উঠে এবং বিভিন্ন বিষয়ে অংশ নেয়।

৬। এস.আর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কোনটিতে পারদর্শিতা অর্জন করেছে?

ক. প্রাথমিক প্রতিবিধান খ. গ্যাজেট তৈরি গ. টেন্ডারফুট ব্যাজ তৈরি ঘ. স্যানিটেশন

৭। জি. এম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কোনটিতে সক্রিয় হয়ে উঠে?

ক. সেলাই খ. কৃষি গ. স্যানিটেশন ঘ. ল্যাশিং

৮। গ্যাজেট কী?

ক. বিভিন্ন গেরো সম্পর্কে জানা খ. কয়েকটি বাঁশকে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা

গ. বাঁশ দিয়ে আসবাবপত্র রাখার ব্যবস্থা করা ঘ. কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা করা

৯। উপদল পতাকায় সাদা রঙ কী নির্দেশ করে?

ক. তারুণ্যের উদ্দীপনা খ. সোনালি আঁশ

গ. নতুন সূর্যোদয় ঘ. ভ্রাতৃত্বের চিহ্ন

১০. গার্ল গাইডের উদ্দেশ্য কী?

ক. নিজেকে বড়ো মনে করা খ. নিজের আর্থিক সুবিধা লাভ করা

গ. সেবা করার জন্য তৈরি থাকা ঘ. সহপাঠীদের বিরোধ মীমাংসা করা

২০২৩

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পরিচিতি ও স্বাস্থ্যসেবা

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে অনেকের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে তারা লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে। অনেকে লেখাপড়া ছেড়ে দেয় ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। যেসব দ্রব্য সেবন করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে ও নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং এগুলোর প্রতি আসক্তি জন্মে, সেগুলোই হলো মাদকদ্রব্য।

বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

১. মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্ত হওয়ার কারণ জানতে পারব।

২. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে মাদকের পরিণতি ব্যাখ্যা করতে পারব।

৩. ধূমপান ও মাদকের বিষয়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হব।

৪. ধূমপান ও মাদকের পরিণতি উপলব্ধি করে পরিশীলিত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ–১ : মাদক ও মাদকাসক্তি

যেসব দ্রব্য সেবন করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এবং আসক্তি জন্মে সেগুলোই মাদকদ্রব্য। যেমন – গাঁজা, হেরোইন ইত্যাদি। মাদক সেবন করলে লেখাপড়ায় মন বসে না,

বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে, মাদকদ্রব্যের প্রতি তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্ভরশীলতার সৃষ্টি হয়। ফলে মাদকের প্রতি যেমন তাদের তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তেমনি মাদকদ্রব্য গ্রহণের পরিমাণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। যদি কোনো কারণবশত তারা মাদকদ্রব্য সেবন করতে না পারে, তখন তাদের মধ্যে মাদকের অভাবজনিত কারণে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন- মেজাজ খিটমিটে হয়, ক্ষুধা কমে যায় এবং আচরণ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

মাদকাসক্তি : তোমরা তোমাদের আশেপাশে অনেককে ধূমপান করতে দেখো। বিড়ি, সিগারেট, চুরুট ও তামাকের ধোঁয়া সেবন করাকে বলে ধূমপান। যেসব দ্রব্য সেবন করলে আসক্তি সৃষ্টি হয়, জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি কমে যায়, সেগুলো হলো মাদকদ্রব্য। আমাদের দেশে যেসব মাদকদ্রব্য ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলো হলো-সিগারেট, বিড়ি, তামাক, চুরুট, মদ, গাঁজা, চরস, ভাং, মারিজুয়ানা, হেরোইন, ফেনসিডিল, ইয়াবা ইত্যাদি। কখনো কখনো ওষুধও মাদকদ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলোর মধ্যে ঘুমের ওষুধই বেশি। মাদক সেবনের ফলে মাদকের প্রতি প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক নির্ভরতা সৃষ্টি হয়। একবার মাদকের নেশা হলে দেহ ও মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। ফলে সে বারে বারে মাদক গ্রহণ করে। এসব ব্যক্তির মাদকাসক্তি নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা, মনোচিকিৎসা এবং সহমর্মিতা প্রয়োজন।

কাজ-১ : মাদকদ্রব্য সেবনে মানুষের আচরণে কী পরিবর্তন ঘটে?

পাঠ-২ : ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে মাদকের পরিণতি

এবার মাদক গ্রহণে সমাজে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা জেনে নাও।

১. মাদকদ্রব্য মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। যেমন- শেখার ও কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস করে, আবেগের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। চাপ সহ্য করার এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে। তাছাড়া মানসিক পীড়ন বাড়িয়ে দেয়।

২. মাদকদ্রব্য পারিবারিক ও সমাজজীবনে নানারকম যন্ত্রণাদায়ক প্রভাব ফেলে। মাদকদ্রব্য সেবনকারী পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে উগ্র আচরণ করে। পরিবারের মানসিক শান্তি বিনষ্ট হয়।

৩. এগুলোর ব্যবহার শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। মাদকদ্রব্য সেবন মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষকে ধ্বংস করে, সূক্ষ্ম অনুভূতি কমিয়ে দেয় এবং খাদ্যাভ্যাস নষ্ট করে।

৪. কিছু কিছু মাদক এইচআইভি ও হেপাটাইটিস-বি এর সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়।

৫. মাদক গ্রহণের ফলে এগুলোর ওপর সেবনকারীর শারীরিক ও মানসিক নির্ভরতা তৈরি হয়, যা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না।

৬. মাদক গ্রহণ করলে যে সমস্ত জটিল রোগ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে খাদ্যনালী ও শ্বাসনালীর ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস ও ব্লাড প্রেসার।

৭. তামাক ও তামাকজাতীয় মাদক শরীরের ভেতর প্রতিটি রক্তনালিতে প্রদাহের সৃষ্টি করে। এর ফলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্ত চলাচল কমে যায়, কখনো রক্ত চলাচল একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়, কখনো বা রক্তনালি ফেটে যায়। ফলে হার্ট এটাক ও ব্রেইন স্ট্রোক হতে পারে।

৮. এ ছাড়া যারা দীর্ঘসময় ধরে ধূমপান করে তাদের শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতি হয়।

৯. মাদক ক্রয়ে আর্থিক ক্ষতি হয়। নেশার টাকার জন্য পরিবারে চাপ সৃষ্টি করে, কখনো কখনো আক্রমণ করে, রাস্তা-ঘাটে ছিনতাই করে টাকা-পয়সা ও মালপত্র লুট করে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসার খরচ যোগাতে গিয়ে সংসারে অভাব দেখা দেয়। এসব ক্ষতিকর দিকগুলো পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করে ফেলে। সেজন্য মাদকদ্রব্য ও ধূমপান থেকে শুধু নিজেকে বিরত রাখলেই চলবে না, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠীসহ আশপাশের লোকজনকে এ থেকে বিরত রাখতে হবে। এসবের কুফল সম্পর্কে সকলকে জানাতে হবে এবং এগুলো সেবন না করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

কাজ–১ : মাদকদ্রব্য গ্রহণের চারটি কুফল লিখ

১.

২.

৩.

৪.

কাজ–২ : উপরোক্ত কুফলগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে মারাত্মক মনে হয়, সেটি প্রথমে, এর পর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য কুফলের তালিকা তৈরি কর। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তালিকাগুলো বোর্ডে প্রদর্শন কর।

পাঠ–৩ : মাদকাসক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সমবয়সীদের প্রভাব

পরিবারের বাবা–মা বা অন্য কোনো সদস্য যদি নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে, তাহলে সেই পরিবারের সন্তানেরা সহজেই মাদকাসক্ত হতে পারে। মাদকাসক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সমবয়সী, বন্ধু, সহপাঠী ও সঙ্গী–সাথীদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা দিনের অধিকাংশ সময়ই স্কুলে এবং বন্ধু বা সঙ্গী–সাথীদের সাথে কাটায়। সঙ্গী–সাথীদের কেউ যদি মাদকে আসক্ত হয়, তাহলে তার প্ররোচনায় বা নিজেরা কৌতূহলবশত মাদক সেবন করলে সে ধীরে ধীরে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। বন্ধু বা সাথীদের এ ধরনের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রয়োজন আত্মসচেতনতা ও দৃঢ় মনোবল।

কাজ–১ : মাদকাসক্ত ব্যক্তি পরিবার ও সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি বয়ে আনে। কথাটি কি ঠিক? ব্যাখ্যা কর।

পাঠ–৪ : মাদকাসক্তি প্রতিরোধ

সমাজে মাদকাসক্তদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি থেকে নিজ পরিবার ও সমাজকে কীভাবে রক্ষার জন্য তোমরা যা করতে পারো –

১. মাদকদ্রব্য ও এর অপব্যবহার সম্পর্কে এলাকার যুবসমাজকে এবং জনগণকে সচেতন করার জন্য পাড়ায় বা মহল্লায় মাদকবিরোধী সংগঠন ও ক্লাব গড়ে তোলা। এসব সংগঠনের মাধ্যমে মাদকবিরোধী প্রচার ও র‍্যালি পরিচালনা করা;

২. সামাজিক ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষক, ক্রীড়াবিদ, জনপ্রিয় অভিনেতা, শিল্পী এসব ব্যক্তিত্বের মাদকবিরোধী প্রচারণায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা;

৪. মসজিদের ইমামগণ জুমার নামাজের খুতবায়, মন্দিরে ও গির্জায় প্রার্থনায় এবং অন্যান্য জাতীয় দিবসে মাদকের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে পারেন;

৫. স্কুল কর্তৃপক্ষ স্কুলকে ধূমপান ও মাদকমুক্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে এ সংক্রান্ত ব্যবস্থা নিতে পারে;

৬. মাদকের কুফল ও মাদকাসক্ত ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার কিছু চিত্র পোস্টার স্কুলে, হাট-বাজারে ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টাঙিয়ে জনগণকে সচেতন করা।

কাজ-১ :	মাদকবিরোধী র‍্যালিতে প্রচারণার জন্য তিনটি স্লোগান গান তৈরি কর।

পাঠ-৫ : মাদক গ্রহণের চাপ মোকাবিলা

তোমার বন্ধু-বান্ধব বা সহপাঠী কেউ মাদকদ্রব্য সেবনের অনুরোধ করলে বা তোমার ওপর চাপ প্রয়োগ করলে তুমি কৌশলে তা এড়িয়ে যাবে। মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রস্তাব বা চাপ এড়ানো ও প্রত্যাখ্যানের উপায়-

১. যেসব জায়গায় মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়, সেসব জায়গায় যাবে না। সেখানে বিভিন্ন ধরনের খারাপ লোক থাকে, তারা তোমাকে এসব মাদক গ্রহণে চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

২. যদি তোমার কোনো বন্ধু বা সহপাঠী তোমাকে কোনো ওষুধ বা ট্যাবলেট দিয়ে বলে, এটা খেলে তুমি বাড়তি শক্তি পাবে বা শরীর চাঙ্গা হবে, তখন এসব ওষুধ বা ট্যাবলেট গ্রহণ করবে না। বন্ধুকে এসব দ্রব্যের খারাপ দিক সম্পর্কে জানিয়ে তাকেও এসব গ্রহণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে।

৩. পাড়া / মহল্লায় বা স্কুলে যারাই মাদকদ্রব্য সেবন করবে, তাদের সাথে মিশবে না।

৪. যদি কোনো বন্ধু তোমাকে দোকানে বসে আড্ডা দেওয়ার প্রস্তাব করে, তাকে বিনয়ের সাথে 'না' বলবে। ঐ সময় পড়ালেখা বা খেলাধুলা করে সময় কাটানো অনেক ভালো এ কথা তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

৫. ধূমপানসহ যেকোনো মাদকদ্রব্য সেবন ধর্মীয় দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। এই নিষেধ মেনে চলবে।

৬. মানুষের জীবনে যেকোনো সময় দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে পারে। এর প্রতিকার মাদক গ্রহণ নয়, নিজের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল অটুট রাখতে হবে।

৭. অবসর সময়ে খেলাধুলা কিংবা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে সময় কাটাবে।

৮. সংসারে ছোটোখাটো কাজ করে বড়দেরকে সাহায্য করবে। এর ফলে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে।

৯. বন্ধু–বান্ধব মিলে সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করলে সমাজের উপকার হবে। নিজের মনে উদ্যম ও আনন্দের সঞ্চার হবে এবং মাদকমুক্ত থাকতে সহায়তা করবে।

১০. গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকমুক্ত থাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, হাসপাতাল, ক্লিনিক, প্রেক্ষাগৃহ, থিয়েটার, শিশুপার্ক, পাবলিক পরিবহন, খেলার মাঠ ও রেস্টুরেন্টের অভ্যন্তরে ধূমপান করা যাবে না। এই আইন লঙ্ঘন করলে তিনশত টাকা অর্থদণ্ডের আইন করা হয়েছে (২০১৩)। লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ একই ধরনের অপরাধ করলে তাকে পর্যায়ক্রমে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে অর্থদণ্ড দিতে হবে।

কাজ–১ :	তোমার দুইজন ধূমপায়ী বন্ধু তোমাকে ধূমপান শুরু করার জন্য চাপ দিচ্ছে। তুমি কীভাবে এই চাপ প্রতিহত করবে? ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনো ব্যক্তির মাদকাসক্তি নিরাময়ের জন্য কোনটি বেশি প্রয়োজন?

ক. পড়ালেখায় মনোযোগী করা খ. বেড়াতে নিয়ে যাওয়া

গ. ভাল আচরণ করা ঘ. খেলাধুলায় অন্তর্ভুক্ত করা

২. কোনটি মাদকদ্রব্য নয়?

ক. চরস খ. মারিজুয়ানা

গ. ক্যাফেইন ঘ. প্যাথেড্রিন

৩. মাদকাসক্ত ব্যক্তির মাদকের অভাবে কোনটি ঘটে?

ক. খাবারের অরুচি হয় খ. ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়

গ. বন্ধু বান্ধবকে এড়িয়ে চলা ঘ. খাবারের চাহিদা হ্রাস

৪. তামাক ও তামাক জাতীয় মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে কোনটি হতে পারে?

ক. সর্দি-কাশি খ. ইনফ্লুয়েঞ্জা

গ. হার্ট এটাক ঘ. ডায়াবেটিস

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রাতুল ইদানিং প্রায়ই দেরি করে বাড়ি ফিরে। বাড়িতে এসে নিজের ঘরে চলে যায় এবং অন্যদের সাথে কথা বলে না। তাছাড়া পরিমিত ও নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করে না। বাবা- মা রাতুলের এই পরিবর্তনে ভীষণভাবে চিন্তিত।

৫. রাতুলের এ ধরনের পরিবর্তনের কারণ কী হতে পারে?

ক. অতিরিক্ত পড়ার চাপ খ. বয়ঃসন্ধিকাল

গ. মাদক দ্রব্য গ্রহণ ঘ. শিক্ষকের বকাঝকা খাওয়া

৬. রাতুলের এ অবস্থার প্রতিরোধে প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে-

i. পারিবারিক উদ্যোগ

ii. বিদ্যালয়ের কর্মসূচি

iii. বন্ধুবান্ধবের সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

পি. এল স্কুলের দেয়ালে লেখা ছিল 'মাদকাসক্তি একটি সর্বনাশা ব্যাধি'।

৭. দেয়াল লিখনটির মূল কথা-

i. মাদক গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

ii. মাদক গ্রহণ রোধে সচেতনতা

iii. মাদক গ্রহণ নিষিদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮. বিনা কারণে তোমার কোনো বন্ধু তোমাকে ট্যাবলেট খেতে দিলে তুমি-

i. সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করবে

ii. তোমার বন্ধুকে বুঝিয়ে না বলবে

iii. এসব থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

সৌরভ ও তার কয়েকজন সহপাঠী সমাজে মাদকাসক্তি প্রতিরোধে একসাথে কাজ করে। মাদক সেবন প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম ও র‍্যালীতে তারা প্রতিনিয়ত বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। তারা মনে করে সমাজ একদিন মাদকমুক্ত হবেই।

৯. সৌরভ মূলত মাদকসেবীদের জন্য কী সৃষ্টি করতে চাচ্ছে?

ক. বন্ধুদের সুদৃঢ়তা খ. সচেতনতা বৃদ্ধি

গ. সুনাগরিকতা বোধ ঘ. সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য

১০. সৌরভের আশাবাদের পূর্ণতায় সমাজ উপকৃত হতে পারে-

i. কর্মক্ষম যুবসমাজ সৃষ্টি করে

ii. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির মাধ্যমে

iii. নিজের অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও iii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

চতুর্থ অধ্যায়

বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা

একটি নবজাত শিশু বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যদের আদরে, স্নেহে বড়ো হয়ে ওঠে। এভাবে বাল্যকাল পার হয়ে কৈশোরে পদার্পণ করে এবং এর সাথে সাথে তার দ্রুত শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে। এই কৈশোরকাল হচ্ছে একটি শিশুর বয়ঃসন্ধিকাল। এ সময় শিশু-কিশোরদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের পাশাপাশি প্রয়োজন নিরাপদ পরিবেশ। পরিবারের সকলের যত্ন ও ভালোবাসার মাঝে যে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর পরিবেশে একটি শিশু বেড়ে ওঠে, সে পরিবেশকে নিরাপদ পরিবেশ বলা হয়।

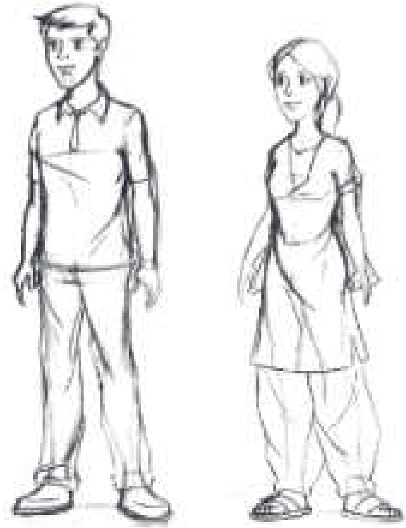

বয়ঃসন্ধিকালের বালক-বালিকা

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

১. বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

২. বয়ঃসন্ধিকালে নিরাপত্তাহীনতার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করতে পারব।

৩. বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক চাপ সামলানোর কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ–১ : বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা

পরিবারের নিরাপদ পরিবেশে শিশু-কিশোররা সুস্থভাবে বেড়ে ওঠে। এজন্য তাদের পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য প্রয়োজন। নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য মা-বাবাসহ পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবের দরকার রয়েছে। এ সময় শিশুরা আদর, স্নেহ, ভালোবাসার মধ্য দিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। কিন্তু অনেক পরিবারে শিশুদের সাথে খারাপ আচরণ, যেমনঃ বকাঝকা, মারপিট, গালাগালি করা হয়। শিশুরা ভয়ে এ ধরনের শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের কথা কাউকে বলতে পারে না। কোনো কোনো শিশু আবার যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। শিশুশ্রমে নিয়োজিতদের বেলায় এটা দেখা যায়। বাল্যবিবাহ, যৌতুকপ্রথা কিশোরীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় বাঁধা।

পাঠ– ২ : বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন

নিরাপত্তাহীনতার বিভিন্ন দিক : ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে যদি কোনো কাজ করতে বাধ্য করা হয় এবং বাধ্যতামূলকভাবে সে কাজ করতে গিয়ে যদি তা তার শারীরিক বা মানসিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাকে নিপীড়ন বলা যায়। যেকোনো বয়সের ছেলেমেয়ে, নারী–পুরুষকে প্রচণ্ডভাবে বকাবকি করা, উচ্চৈঃস্বরে ধমক দেওয়া, অপমান করা, শারীরিকভাবে আঘাত করা কিংবা মারধর করা– এসব কাজ নিপীড়নের আওতায় পড়ে। আমাদের সমাজে কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বেশি নিপীড়নের শিকার হয়। শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলে তাকে শারীরিক নিপীড়ন বলে। যে সমস্ত কাজ, আচরণ, কথা প্রভৃতি শিশু-কিশোরকে মানসিক কষ্ট দেয় এবং শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে, তাকে মানসিক নিপীড়ন বলে। যেমন: গৃহকর্মী হিসেবে একটি শিশুকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজে বাধ্য করা, তার পক্ষে সে কাজ করা সম্ভব না হলে তাকে বকুনি দেওয়া ছাড়াও শারীরিক নির্যাতন করা বা গৃহসামগ্রী দিয়ে আঘাত করা হয়। ফলে ঐ শিশুটি শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যৌননিপীড়ন : যৌননিপীড়ন আরেকটি বিষয় যা শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। অসৎ উদ্দেশ্যে কারো শরীরের কোন অংশে বিশেষত পোশাকে ঢেকে রাখা অংশে হাত বা অন্য কোনো অঙ্গ দিয়ে স্পর্শ বা আঘাত করা হলে তাকে যৌননিপীড়ন বলা হয়। যৌননির্যাতনের শিকার একজন কিশোর-কিশোরীর পরবর্তীতে স্বাভাবিক জীবনে আসতে কষ্ট হয়। সে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নিগৃহীত হয়।

কাজ-১ : শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন থেকে নিজেকে রক্ষা করার উপায়। নিচে লেখা উপায়ের মধ্যে যেটা সঠিক তার ডানে টিক (√) চিহ্ন দাও, আর ভুল হলে ক্রস (×) চিহ্ন বসাও।

১. নিজের কাজে মনোযোগী হওয়া।
২. কোনো সমস্যা দেখা দিলে মা–বাবা বা অভিভাবকের সাথে আলোচনা না করা।
৩. নিপীড়নের প্রতিবাদ করা।
৪. পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝে কাজ না করা।
৫. আত্মসচেতন হওয়া।
৬. অপরিণত বয়সে সন্তান ধারণ করলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যহানি হওয়া।

কাজ-২ : বাল্যবিবাহ কাকে বলে এবং বাল্যবিবাহের ফলে মা ও শিশুর কী ক্ষতি হয়– ধারাবাহিকভাবে লিখ।

পাঠ–৩ : বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার উপায়

বয়ঃসন্ধিকালে শিশু–কিশোরেরা শারীরিকভাবে দ্রুত বেড়ে ওঠে। এর সাথে সাথে তাদের মানসিক বিকাশ ঘটে। এ সময়ে তাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা খুব প্রয়োজন। সুতরাং স্বাস্থ্য যাতে অটুট থাকে, সেদিকে প্রত্যেকেরই লক্ষ রাখা উচিত। সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে হলে যেমন শরীরের যত্ন নিতে হয়, তেমনি স্বাস্থ্য বিধানসমূহ মেনে চলতে হয়। তাহলে আমাদের জানা প্রয়োজন, কীভাবে আমরা সুস্থ থাকব অর্থাৎ কীভাবে আমরা স্বাস্থ্য রক্ষা করব। শরীরের গঠন ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় রাখা এবং নীরোগ থাকাই হচ্ছে স্বাস্থ্যরক্ষা। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে।

দৈহিক স্বাস্থ্য : শিশুকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত অর্থাৎ সাধারণত ২৫ বছর পর্যন্ত একজন মানুষের দেহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময়কালে এই দৈহিক বৃদ্ধি কখনো ধীরে, কখনো দ্রুত ঘটে। ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি স্থির থাকে। এরপর আর দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে না, বরং ক্ষয় হতে শুরু করে। কাজেই যেকোন বয়সের একজন ব্যক্তির শরীর সুস্থ রাখতে হলে তাকে বয়সোপযোগী সুষম খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। তাহলে সে তার দৈহিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পারবে।

মানসিক স্বাস্থ্য : কোনো কারণে মানসিক অশান্তি থাকলে কাজে মন বসে না। দেহের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। আবার শরীর খারাপ থাকলে মন খারাপ হয়– চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা কমে যায়। তাই দৈহিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্যও ঠিক রাখতে হবে। কারণ শরীর ও মনের সম্পর্ক নিবিড়, একে অপরের পরিপূরক।

দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার উপায় : স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষায় সচেষ্ট হতে হবে। এ জন্য প্রথমে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আর তা হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা। স্বাস্থ্যবিষয়ক নিয়মকানুন বা স্বাস্থ্যবিধির মধ্যে রয়েছে সময়ানুবর্তিতা, পরিস্কার–পরিচ্ছন্নতা, প্রয়োজনীয় ও পরিমিত ব্যায়াম, বিশ্রাম ও ঘুম, প্রয়োজনীয় পরিমাণে সুষম খাদ্য গ্রহণ, নিয়মিত খেলাধুলা, বিনোদন, সদা প্রফুল্ল থাকা, মাদকদ্রব্য বর্জন, আনন্দদায়ক বইপত্র পাঠ, সুষ্ঠ বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন ইত্যাদি।

কাজ-১ : গত তিন মাসে তোমার বাড়িতে এবং স্কুলে বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর মধ্যে যেসব ঘটনা তোমার মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে, সেগুলো চিহ্নিত কর এবং প্রতিটির বর্ণনা লিখ।

ঘটনার উল্লেখ	ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বয়ঃসন্ধিকালে শিশু-কিশোরদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রয়োজন কেন?

ক. শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য
খ. পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণের জন্য
গ. স্নেহ ও ভালোবাসার মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য
ঘ. মা-বাবার কাজে সহযোগিতা করার জন্য

২. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের জন্য দরকার-

i. নিরাপত্তা ii. স্বাস্থ্যরক্ষা iii. আত্মসচেতনতা

পঞ্চম অধ্যায়

জীবনের জন্য খেলাধুলা

মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া হচ্ছে খেলাধুলা। একটি মানবশিশু খেলাধুলার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে। খেলাধুলার জন্য কর্মক্ষম ও সুস্থ দেহ খুবই প্রয়োজন। আমাদের দেহ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত। সঠিক অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কর্মক্ষমতা, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বৃদ্ধি পায়। খেলাধুলার মাধ্যমেই এ কাজটি করা সম্ভব। শৈশবে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্রুত বেড়ে ওঠে বলে অনেক সময় মাংসপেশির সঙ্গে স্নায়ুর সমন্বয় ঘটে না। এই সমন্বয়হীনতা দূর করার জন্য ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা করা অপরিহার্য। সুস্থ, সবল, নীরোগ ও কর্মক্ষম শরীর গঠন অর্থাৎ সুন্দর জীবনের জন্য সবাইকে খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করা উচিত।

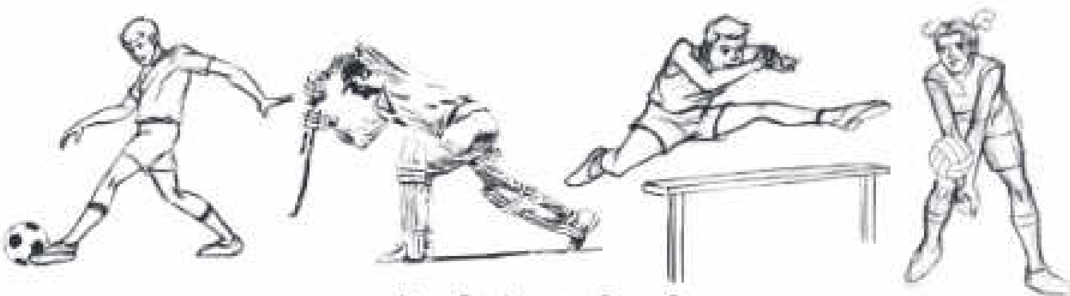

ফুটবল, ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্স, ভলিবল

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

১। দেশি ও বিদেশি খেলার পার্থক্য বর্ণনা করতে পারব।

২। ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, ভলিবল এবং অ্যাথলেটিক্সের নিয়মগুলো বর্ণনা করতে পারব।

৩। চারটি খেলা (ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, ভলিবল) এবং অ্যাথলেটিক্সের নিয়মগুলো মেনে অনুশীলন করতে পারব।

৪। আগ্রহ অনুযায়ী কমপক্ষে একটি খেলায় বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ করে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারব।

পাঠ–১ দেশি ও বিদেশি খেলা

বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিতে বিভিন্ন খেলাধুলার প্রচলন রয়েছে। এসব খেলাকে দেশি খেলা নামে অভিহিত করা যায়। যেমন : দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, বৌচি, ডাংগুলি, এক্কাদোক্কা, হাডুডু ইত্যাদি। এসব আঞ্চলিক খেলাধুলার বাইরে অন্যান্য খেলাধুলা যেমন: ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল, টেনিস, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি আন্তর্জাতিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব খেলার উৎপত্তি বাংলাদেশে হয়নি। তাই এগুলোকে বিদেশি খেলা বলে।

কাবাডি : কাবাডি এশিয়া মহাদেশের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশসমূহের জনপ্রিয় খেলা। বিশেষ করে পাক–ভারত উপমহাদেশে এটি একটি প্রাচীন খেলা। এই উপমহাদেশে অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন নামে খেলাটি অনুষ্ঠিত হতো। যেহেতু আঞ্চলিক খেলা তাই বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ছিল না। গ্রাম অঞ্চলে এই হা–ডু–ডু খেলাই ছিল বিনোদনের একমাত্র উৎস। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হা–ডু–ডু খেলার পোশাকি নাম কাবাডি। বাংলাদেশ ও ভারতের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাফ গেমসে কাবাডি খেলা নিয়মিত ইভেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকে কাবাডি খেলা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখে। ১৯৯০ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে কাবাডি খেলা অন্তর্ভুক্ত হলে এ খেলা আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত হয়।

কাবাডি খেলার কোর্ট : মাঠ হবে সমান্তরাল ও নরম, মাটি অথবা ম্যাট দ্বারা তৈরি। কাবাডি খেলার মাঠ তিন ধরনের–

১. পুরুষ ও জুনিয়র বালক–১৩ × ১০ মি.

২. মহিলা ও জুনিয়র বালিকা–১২ × ৮ মি.

৩. সব জুনিয়র বালক ও বালিকা–১১ × ৮ মি.

সাব জুনিয়র কাবাডি সেটের বর্ণনা

এই খেলায় প্রতিদলে মোট ১২জন খেলোয়ার থাকে। ৭জন মাঠ খেলোয়াড় ও ৫জন অতিরিক্ত খেলোয়াড়। আমরা এখানে সব জুনিয়র বালক–বালিকাদের কোর্টের বর্ণনা দিব। যে সমস্ত বালক–বালিকাদের ওজন ৫০ কেজি বা তার নিচে এবং বয়স অনূর্ধ্ব ১৬ বছর তাদের জন্য কাবাডি কোর্টের পরিমান দৈর্ঘ্য ১১ মিটার ও প্রস্থ ৮ মিটার।

সাব–জুনিয়র কাবাডি কোর্ট

মিডলাইন থেকে বকলাইনের দূরত্ব ৩ মিটার। বকলাইন থেকে বোনাস লাইনের দূরত্ব ১ মিটার বোনাস লাইন থেকে এন্ড লাইনের দূরত্ব ১.৫ মিটার। কোর্ট থেকে সিটিং ব্লকের দূরত্ব ২ মিটার। সিটিং ব্লকের পরিমাপ হবে ১ × ৬ মিটার কাবাডি কোর্টের প্রত্যেকটি দাগ ৫ সে মি. চওড়া। সাব-জুনিয়র খেলার স্থিতিকাল ১৫ মি. + ৫ মি. + ১৫ মি. = মোট ৩৫ মিনিট। দুই অর্ধের মধ্যে বিরতি কাল ৫ মিনিট। কোর্টের দুই পাশের ১ মিটার লম্বা জায়গাকে লবি বলে। ট্রাগল শুরু হলে লবি খেলার মাঠের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়। এক নিশ্বাসে এক নাগাড়ে কাবাডি কাবাডি বলাকে দম (cant) বলে। রেইডার দমসহ বিপক্ষ খেলোয়াড়ের যতজনকে ছুঁয়ে আসবে তার দল তত পয়েন্ট পাবে। তাকে ধরে রাখলে বিপক্ষ দল ১ পয়েন্ট পাবে। কোনো দলের সমস্ত খেলোয়াড় মরা (out) হলে তাকে লোনা বলে। এজন্য বিপক্ষ দল অতিরিক্ত ২ পয়েন্ট পায়, যাকে লোনা বলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে দল বেশি পয়েন্ট পাবে সে দল জয়ী হবে।

কাজ–১ : কাবাডি খেলার জয় পরাজয় কিভাবে নিধারিত হয় তা ব্যাখ্যা কর।

পাঠ–২ ফুটবল

ফুটবল খেলা পৃথিবীর জনপ্রিয় খেলাগুলোর অন্যতম। সব দেশে একই নিয়মে খেলার জন্য ১৯০৪ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা 'ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা ফিফা' গঠিত হয়। ১৯৩০ সাল থেকে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রতি চার বছর পর পর বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে প্রথম ফুটবল খেলা অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) গঠিত হয়। এটি বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ন্ত্রণকারী সর্বোচ্চ সংস্থা। ফুটবল বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় একটি খেলা। এই খেলার মাধ্যমে সহযোগিতার মনোভাব, আত্মবিশ্বাস, ক্ষিপ্রতা, নেতৃত্ব এবং নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রভৃতি সৎগুণের বিকাশ ঘটে।

আইনকানুন

১. খেলার মাঠ : আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার মাঠ দুই ধরনের পরিমাপে হয়। একটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য ১১০ গজ ও প্রস্থ ৭০ গজ। অন্যটি দৈর্ঘ্য ১২০ গজ ও প্রস্থ ৮০ গজ। গোলপোস্ট উচ্চতায় ৮ ফুট এবং এক পোস্ট থেকে অন্য পোস্টের দূরত্ব ২৪ ফুট। উভয় গোলপোস্ট থেকে পাশে ৬ গজ এবং মাঠের দিকে ৬ গজ দূরত্ব নিয়ে যে আয়তক্ষেত্র তৈরি হয়, তাকে গোল এরিয়া বলে। উভয় গোলপোস্ট থেকে পাশে ১৮ গজ ও মাঠের দিকে ১৮ গজ দূরত্ব নিয়ে যে আয়তক্ষেত্র তৈরি হয়, তাকে পেনাল্টি এরিয়া বলে। দুই পোস্টের ঠিক মাঝখান থেকে মাঠের ভিতরে ১২ গজ সামনে একটি পেনাল্টি স্পট থাকে। প্রত্যেক পেনাল্টি মার্ককে কেন্দ্র করে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে একটি বৃত্তচাপ আঁকতে হবে। একে পেনাল্টি আর্ক বলে। মাঠের প্রতি কর্নারে একটি করে ফ্ল্যাগপোস্ট স্থাপন করতে হবে। ফ্ল্যাগপোস্টের উচ্চতা কমপক্ষে ৫ ফুট হতে হবে এবং এর অগ্রভাগ চোখা হবে না। প্রতি কর্নার ফ্ল্যাগপোস্টকে কেন্দ্র করে ১ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে মাঠের মধ্যে একটি বৃত্তাংশ আঁকতে হবে। উভয় গোলপোস্ট ক্রসবারের চওড়া ৫ ইঞ্চি এর বেশি হবে না। গোলপোস্ট এবং ক্রসবারের রং অবশ্যই সাদা হবে। মাঠের সকল দাগের চওড়া ৫ ইঞ্চি এর বেশি হবে না।

২. **বল :** বলের আবরণ চামড়া বা ঐ জাতীয় কোনো অনুমোদিত বস্তু দ্বারা তৈরি হবে। বলের আকার হবে গোলাকার। বড়োদের জন্য বলের পরিধি হবে ৬৮-৭০ সে.মি. স্কুল প্রতিযোগিতার সময় পরিচালনা কমিটি ছোটো পরিধি বল দিয়ে খেলতে পারে।

৩. **খেলোয়াড় সংখ্যা :** খেলা দুই দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় প্রতি দলে ১১ জনের বেশি খেলোয়াড় থাকবে না। ১১ জনের মধ্যে একজন গোলরক্ষক থাকবে। যদি কোনো দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় থাকে তবে খেলা আরম্ভ করা যাবে না।

৪. **খেলোয়াড়ের সাজ-সরঞ্জাম :** আন্তর্জাতিকভাবে জার্সি, হাফ প্যান্ট, মোজা, সিনগার্ড ও জুতা (ফুটওয়ার) ছাড়া খেলা যায় না। তবে আঞ্চলিকভাবে স্কুল পর্যায়ে এসব ছাড়াও খেলা হয়।

৫. **রেফারি :** খেলা পরিচালনার জন্য একজন রেফারি থাকবেন।

৬. **সহকারী রেফারি :** খেলায় দুজন সহকারী রেফারি নিযুক্ত হবেন। তারা আইন অনুযায়ী রেফারিকে খেলা পরিচালনায় সাহায্য করবেন। এছাড়া মাঠের বাইরে একজন চতুর্থ রেফারি থাকেন।

৭. **খেলার স্থিতিকাল :** খেলার নির্ধারিত সময় ৯০ মিনিট। প্রতি অর্ধে ৪৫ মিনিট করে বিভক্ত। মাঝে বিরতি ১৫ মিনিটের বেশি হবে না। স্কুলের খেলোয়াড়দের জন্য কর্তৃপক্ষ খেলার সময় কমাতে পারে।

৮. **খেলা আরম্ভ :** খেলার শুরুতে টসে জয়ী দলকে অবশ্যই মাঠের যেকোনো সাইড বেছে নিতে হবে। টসে পরাজিত দল রেফারির সংকেতের সাথে সাথে 'কিক অফ'-এর মাধ্যমে খেলা শুরু করবে। এই কিক অফ খেলার শুরুতে, গোল হবার পর এবং হাফ টাইমের পর হয়ে থাকে। কিক অফ থেকে সরাসরি গোল হয়।

৯. **বল খেলার মধ্যে ও বাইরে :** বল যদি গড়িয়ে বা শূন্যে সম্পূর্ণ গোললাইন বা টাচলাইন অতিক্রম করে, তবে সেই বলকে খেলার বাইরে ধরা হয়। রেফারি কর্তৃক খেলা বন্ধ হলে বল খেলার বাইরে আছে বলে গণ্য হয়।

১০. **গোল হওয়া :** গোল তখনই হয়, যখন বলের সম্পূর্ণ অংশ দুই পোস্টের ভিতর দিয়ে ও ক্রসবারের নিচ দিয়ে গড়িয়ে বা শূন্যে গোললাইন অতিক্রম করে।

১১. **অফ সাইড :** একজন খেলোয়াড় তখনই অফ সাইড হয়, যখন গোলকিপার ছাড়া বল ও বিপক্ষের অন্তত্পক্ষে একজন খেলোয়াড় তার সামনে না থাকে।

১২. **ফাউল ও অসদাচরণ :** অপরাধ ও অসদাচরণের জন্য দুই ধরনের ফ্রি কিক দেওয়া হয়। যথা-ডাইরেক্টও ইনডাইরেক্ট। নিম্নলিখিত ১০টি অপরাধের জন্য ডাইরেক্ট ফ্রি কিক দেওয়া হয় -

১. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে লাথি মারা বা লাথি মারার চেষ্টা করা।
২. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ল্যাং মারা বা ল্যাং মারার চেষ্টা করা।
৩. বিপক্ষ খেলোয়াড়ের উপর লাফিয়ে পড়া।
৪. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আক্রমণ বা চার্জ করা।
৫. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করা।
৬. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধাক্কা দেওয়া।
৭. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ট্যাকল করা।
৮. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আটকানো বা ধরে রাখা।
৯. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে থুথু দেওয়া।
১০. ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দিয়ে বল ধরা (স্বীয় পেনাল্টি এরিয়ায় গোলরক্ষকের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়)।

নিম্নলিখিত কারণে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক দেওয়া হয় –

১. গোলরক্ষক তার হাতে বল নিয়ন্ত্রণের পর খেলার মাঠে পাঠানোর পূর্বে যদি ৬ সেকেন্ডের বেশি সময় বল ধরে রাখে।
২. গোলরক্ষক একবার বল ছেড়ে দেওয়ার পর অন্য কোনো খেলোয়াড়ের টাচ করার পূর্বেই যদি পুনরায় বলটি ধরে।
৩. স্বীয় দলের কোনো খেলোয়াড়ের ইচ্ছাকৃত কিক করা বল যদি গোলরক্ষক হাত দিয়ে টাচ করে বা ধরে।
৪. নিজ দলের কোনো খেলোয়াড় কর্তৃক থ্রো-ইন করা বল যদি গোলরক্ষক হাত দিয়ে টাচ করে বা ধরে।
৫. বিপজ্জনকভাবে খেলা।
৬. বল না খেলে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের সম্মুখগতিতে বাধা দেওয়া।
৭. গোলরক্ষক বল ছুড়ে দেয়ার সময় তাকে বাধা দেওয়া।

১৩. **ফ্রি কিক :** ফ্রি কিক দুই প্রকার। ক) ডাইরেক্ট ফ্রি কিক, খ) ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক। ডাইরেক্ট ফ্রি কিক থেকে সরাসরি গোল হয়। ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক থেকে সরাসরি গোল হয় না।

১৪. **পেনাল্টি কিক :** ডাইরেক্ট ফ্রি কিকের দশটি অপরাধের যেকোনো একটি পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে ডিফেন্ডার কর্তৃক ঘটলে বিপক্ষ দল পেনাল্টি কিক পায়। পেনাল্টি কিক মারার সময় শুধু গোলকিপার ও কিকার ছাড়া কেউ পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে থাকতে পারে না।

১৫. **থ্রো–ইন :** বল পার্শ্বরেখা অতিক্রম করলে থ্রো-ইন এর মাধ্যমে খেলা শুরু করতে হয়। থ্রো-ইন করার সময় বল দুই হাতে সমান ভর দিয়ে মাথার পেছন দিক থেকে এবং মাথার উপর দিয়ে দুই পা মাঠের বাইরে বা দাগের উপর রেখে বল মাঠের মধ্যে নিক্ষেপ করতে হয়। থ্রো-ইন থেকে সরাসরি গোল হয় না।

১৬. **গোল কিক :** বিপক্ষের ছোঁয়া লেগে যদি বল গোললাইন অতিক্রম করে, তবে গোল কিক হয়। গোল কিক গোল এরিয়ার মধ্য থেকে করতে হয়। গোল কিক থেকে সরাসরি গোল হয়। তবে গোলকিক পেনাল্টি এরিয়ার বাইরে না গেলে বল খেলার মধ্যে গণ্য হয় না।

১৭. **কর্নার কিক :** ডিফেন্ডারদের ছোঁয়া লেগে যদি বল গোললাইন অতিক্রম করে, তবে বিপক্ষ দল একটি কর্নার কিক পায়। গোল পোস্টের যে পাশ দিয়ে বল গোললাইন অতিক্রম করে সেই পাশের কোনা থেকে কর্নার কিক মারতে হয়।

কাজ–১ : পেনাল্টি কিকের কৌশলগুলো প্রদর্শন কর।

পাঠ–৩ : কলাকৌশল

১. কিকিং

ক. **লো হার্ড কিক বা জোরালো কিক :** জোরে নিচু দিয়ে কোনো বল অল্প দূরত্বে সোজাসুজি পাঠাতে হলে বলের দিকে সোজা আসতে হবে। পায়ের পাতার ভেতরের ওপর অংশ দিয়ে বলের মাঝখানে বা পেটে সজোরে লাথি মারতে হবে। যে পা দিয়ে কিক করবে, সে পায়ের হাঁটু এবং কোমর বলের ওপর ঝুঁকে থাকবে। অন্য পা বলের ৭/৮ ইঞ্চি দূরে প্রায় সোজাসুজি অবস্থান করবে। এ কিককে ইনস্টেপ কিক বলে। বল উঁচু দিয়ে দূরে পাঠাতে হলে সোজা না এসে একটু কোনাকুনিভাবে দৌড়ে আসবে এবং বলের পেটের নিম্নভাগে আঘাত করবে। পায়ের পাতার অগ্রভাগ সম্পূর্ণ নিম্নমুখ না রেখে কিছুটা কোনাকুনিভাবে রাখবে।

লো হার্ড কিক

খ. **ভলি কিক :** ওপর দিয়ে বল দূরে পাঠাবার জন্য বল মাটিতে পড়ার পূর্বেই বা মাটিতে পড়ে কিছুটা ওপরে উঠলে যে কিক দেওয়া হয় তাকে ভলি কিক বলে।

ভলি কিক

গ. **হাফ ভলি কিক :** বল মাটিতে পড়ার পরক্ষণেই ওপরে উঠতে শুরু করার সাথে সাথে জোরে যে কিক করা হয়, তাকে হাফ ভলি কিক বলে। হাফ ভলি কিক খুব জোরালো হয়।

ঘ. **চিপ শট :** অল্প দূরের সঙ্গীর কাছে উঁচু দিয়ে বল পাঠাবার পদ্ধতিকে চিপ শট বলে। যখন নিচু দিয়ে বা গড়িয়ে নিজ দলের খেলোয়াড়ের কাছে বল পাস করা সম্ভব হয় না অর্থাৎ বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় দ্বারা বল ধরে ফেলার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তখন এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বা দু-এক পা দূর থেকে এসে পায়ের ভিতর অংশ দিয়ে বলের পেটের নিচের অংশে কিক করতে হবে।

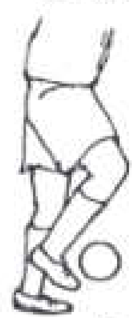

হাফ ভলি

২. ট্র্যাপিং বা বল আটকানো

ক. **সোল ট্র্যাপিং** (পায়ের পাতার তলদেশ দিয়ে বল থামানো) : পায়ের পাতার অগ্রভাগ ওপরের দিক করে গোড়ালি মাটি থেকে ৩/৪ ইঞ্চি ওপরে তুলে, অনেকটা ইংরেজি অক্ষর 'V 'এর মতো করে বল থামানো।

খ. **শিন ট্র্যাপিং (হাঁটুর নিচের অংশ দিয়ে বল থামানো)** : মাটিতে পড়া বল বাউন্স করে ওপরে ওঠার সাথে সাথে হাঁটু ভাঁজ করে সামনের দিকে নিয়ে এবং পায়ের পাতা পিছনে রেখে হাঁটুর নিচের অংশ দিয়ে বল থামানো।

গ. **থাই ট্র্যাপিং (উরুর সাহায্যে বল থামানো)** : প্রায় লম্বভাবে বা ৭৫° থেকে ৮৫° উঁচু দিয়ে আসা বল উরুর ওপর ধরে থামাতে হয়। বল উরু স্পর্শ করার সাথে সাথে বলসহ হাঁটু নিচের দিকে নামিয়ে আনতে হবে।

ঘ. **হেড ট্র্যাপিং (মাথা দিয়ে বল থামানো)** : লম্ব বা তির্যকভাবে আসা বল আস্তে করে মাথায় লাগিয়ে বলের গতি কমিয়ে দিয়ে যতদূর সম্ভব বল নিজের কাছে মাটিতে ফেলা।

৩. **হেডিং** : বল হেড করার সময় নিচের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে :

ক. দৃষ্টি বলের দিকে থাকবে (চোখ কখনো বন্ধ থাকবে না)।

খ. মাথার সম্মুখ অংশে কপাল ও চুলের সন্ধিস্থলে বল লাগবে।

গ. ঘাড় শক্ত রেখে বলে আঘাত করতে হবে।

ঘ. মাথা ঘুরিয়ে বল পাঠানোর দিক পরিবর্তন করতে হবে।

ঙ. পিছনের দিকে হেড করার সময় মাথা সম্পূর্ণ পিছন দিকে নিয়ে কপাল দিয়ে হেড করতে হবে।

৪. **গোল রক্ষা (গোল কিপিং)** : ফুটবল খেলায় গোল কিপিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গোলরক্ষককে বেশির ভাগ সময় হাত দিয়ে বল ধরতে হয়। আবার সময় সময় পা দিয়েও বল আটকাতে বা মারতে হয়। তাই হাত ও পা দিয়ে মারার ও ধরার কলাকৌশল অবশ্যই শিখে নিতে হবে।

বিভিন্নভাবে আসা বল ধরার পদ্ধতি

নিচু বল ধরা

ক. **নিচু বল–** সকল অবস্থায় বলের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। নিচু বল ধরার জন্য সম্পূর্ণ দেহ ঠিক বলের পিছনে রাখবে এবং হাঁটু সোজা রেখে শরীর সামনে ঝুঁকে দুহাত দিয়ে বল কুড়িয়ে নিয়ে বুকের কাছে নিয়ে নেবে।

খ. কোমর সমান বল– কোমর সমান বলকে বলের লাইনে দাঁড়িয়ে ধরতে হয়। বল ধরার সঙ্গে সঙ্গেই তলপেটটাকে ভিতরের দিকে নিয়ে বলটাকে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েই দুই হাত দিয়ে বল শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে হবে যেন বলটা ছিটকে না পড়ে।

কোমর সমান বল ধরা

গ. উঁচু বল– উঁচু বল ধরার জন্য দুই হাত সামনে বা ওপরে বাড়িয়ে দুই হাতের তালু বা আঙুলের সাহায্যে বল ধরে বুকের কাছে টেনে আনতে হবে।

উঁচু বল ধরা

৫. বল কাড়াকাড়ি করা (বল ট্যাকলিং) : ফুটবল খেলায় ট্যাকলিং একটা গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাত্মক কৌশল। সামনে, পিছনে ও পাশ থেকে ট্যাকলিং করা যায়। ট্যাকলিংয়ের সময় চোখ অবশ্যই বলের উপর রাখতে হবে। বিপক্ষ যখন তার ভারসাম্য রক্ষা করতে অসুবিধাবোধ করে ঠিক সে মুহূর্তেই ট্যাকলিং করা সোজা ও সুবিধাজনক। ট্যাকলিংয়ের সময় যাতে বিপজ্জনক চার্জ না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

কাজ–১ : ফুটবল খেলার কলাকৌশল ব্যাখ্যা কর এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মাঠে প্রদর্শন কর।

পাঠ–৪ : ক্রিকেট

ক্রিকেট খেলার জন্ম ইংল্যান্ডে। ক্রিকেট একটি জনপ্রিয় খেলা। ক্রিজ বা ক্রিগ শব্দ থেকে ক্রিকেট শব্দটির উৎপত্তি হয়। ক্রিজ শব্দের অর্থ বক্র/বক্ত এবং ক্রিগ শব্দের অর্থ গাছের গুঁড়ি। উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস অজানা থাকলেও ধারণা করা হয় যে, রাখাল বালকের দল মেষ, গরু চড়াতে গিয়ে অবসর সময়ে ক্রিগ গাছের কাটা গোড়াতে নিশানা করত পাথর, শক্ত মাটির দলা কিংবা কোনো গাছের ফল দিয়ে। পরবর্তীতে কোনো রাখাল বালক তার ছড়ি দিয়ে পাথর, শক্ত মাটির দলা কিংবা কোনো গাছের ফল ঠেকাতে চেষ্টা করে। এভাবে ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন এসে ক্রিকেট খেলা বর্তমান রূপ লাভ করে। ক্রিকেট খেলার ৪২টি আইন কানুন আছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে এই আইন কানুন জানা দরকার।

আইনকানুন

১. **খেলোয়াড়–**দেশে ১৪ জন এবং বিদেশে ১৫ জন খেলোয়াড় সমন্বয়ে একটি দল গঠিত হয়। একজন অধিনায়কের নেতৃত্বে ১১জন করে দুই দলে বিভক্ত হয়ে খেলা হয়।

২. **পরিবর্তন–** কোনো খেলোয়াড় খেলার সময়কালীন অসুস্থ বা আহত হয়ে পড়লে আম্পায়ারের অনুমতি সাপেক্ষে তার পরিবর্তে একজন খেলোয়াড় ফিল্ডিং করানো যাবে। কিন্তু ব্যাটিং, বোলিং ও উইকেট কিপিং করানো যাবে না।

৩. **আম্পায়ার–** মাঠে খেলা পরিচালনার জন্য ২জন আম্পায়ার, ১জন রিজার্ভ আম্পায়ার এবং ১জন টিভি আম্পায়ার থাকে। মাঠে আম্পায়ারদ্বয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

৪. **স্কোরার–** যত রান হবে তা রেকর্ড করার উদ্দেশ্যে স্কোরার নিযুক্ত হবেন এবং আম্পায়ার দ্বয়ের নির্দেশ ও সংকেত প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

৫. **বল–** বলের ওজন ও আকার আম্পায়ার ও দুই দলের অধিনায়ক দ্বারা খেলার পূর্বেই অনুমোদন নিতে হবে। খেলার পুরো সময় বল আম্পায়ারদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৬. **ব্যাট–** ব্যাটের দৈর্ঘ্য ৩৮ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৪ $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চির বেশি হবে না।

৭. **পিচ–** পিচের দৈর্ঘ্য ২২ গজ ও প্রস্থ ১০ ফুট।

৮. **উইকেট–** প্রতি প্রান্তে বেলসহ তিনটি করে উইকেট পোতা থাকবে। মাটি থেকে বেলসহ উইকেটের উচ্চতা ২৮ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি।

৯. **বোলিং এবং পপিং ক্রিজ–** উইকেটের সাথে একই রেখায় বোলিং ক্রিজ হবে যার দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি। বোলিং ক্রিজের সামনে ৪ ফুট সমান্তরালভাবে টানা হবে পপিং ক্রিজ।

১০. **পিচের তত্ত্বাবধান–** প্রতি ইনিংসের শুরুতে অধিনায়কের অনুরোধে সর্বোচ্চ ৭ মিনিট করে রোল নিতে পারবে। পিচের ঘাস খেলা শুরুর ৩০ মিনিট আগে ছাঁটা হবে।

১১. **ইনিংস**– প্রতি দল ৫ দিনের খেলায় ২টি করে এবং এক দিনের খেলায় একটি করে ইনিংস পর্যায়ক্রমে খেলবে। ইনিংসের নির্বাচন টস দ্বারা নির্ধারিত হবে।

১২. **ফলো অন**– পাঁচ দিনের খেলায় যে দল প্রথমে ব্যাট করে ২০০ রানে, তিন বা চার দিনের খেলায় ১৫০ রানে, দুই দিনের খেলায় ১০০ রানে এবং ১ দিনের খেলায় ৭৫ রানে এগিয়ে থাকলে প্রতিপক্ষ দলকে ফলো-অন করাতে পারবে।

১৩. **ডিক্লারেশন**– ১ দিনের (সীমিত ওভার) ম্যাচ ছাড়া টেস্ট অথবা যে কোনো দিনের ম্যাচে ব্যাটিং দলের অধিনায়ক খেলা চলার মধ্যে যেকোনো সময় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারবে।

১৪. **খেলা শুরু** – প্রতি ইনিংসের এবং প্রতি দিনের খেলার শুরুতে এবং যেকোনো বিরতির শেষে বোলার প্রান্তের আম্পায়ার 'পে' ডেকে খেলা শুরু করবেন।

১৫. **বিরতি**– মধ্যাহ্নভোজ ৪০ মিনিট, চা বিরতি ২০ মিনিট পানি পান বিরতির ৫ মিনিট (আলাদাভাবে সময় থাকে না) এবং দুই ইনিংসের মাঝে ১০ মিনিট।

১৬. **খেলা সমাপ্তি**– প্রতিদিনের খেলার শেষে এবং খেলার সমাপ্তিতে আম্পায়ার 'টাইম' ডাকবেন, সেই সাথে উভয় উইকেট থেকে 'বেল' গুলো উঠিয়ে নেবেন।

১৭. **স্কোরিং**– 'রান' এর দ্বারা স্কোরের হিসাব করা হবে।

১৮. **বাউন্ডারি**– দুই দলের অধিনায়কের সাথে বাউন্ডারির ব্যাপারে আম্পায়ারকে একমত হতে হবে। সর্বনিম্ন ৫৫ গজ থেকে সর্বোচ্চ ৯০ গজ পর্যন্ত বাউন্ডারি সীমানা টানা হয়।

১৯. **লস্ট বল**– বল যদি কার্যকরী ক্ষমতার মেয়াদ থাকাকালে খুঁজে পাওয়া না যায় তাহলে যে কোনো ফিল্ডম্যান 'লস্ট বল' ডাকতে পারেন। 'লস্ট বল' ডাকা হলে স্কোরে ৬ রান যোগ হবে। কিন্তু 'লস্ট বল' ডাকার আগে যদি ৬ রানের বেশি রান নেওয়া হয়ে থাকে তবে সবকটি রান স্কোরে যোগ করা হবে।

২০. **ফলাফল**– যে দলের মোট রান বিপক্ষের মোট রানের চেয়ে বেশি হবে, সে দলই জয়ী হবে। যদি রান সংখ্যা সমান থাকে এবং অন্য কোনো শর্ত না থাকে তবে খেলাটি অমীমাংসিত বলে ধরা হবে।

২১. **ওভার**– সাধারণত ৬টি বলে একটি ওভার ধরা হয়। বল গড়িয়ে সীমানার বাইরে গেলে ৪ রান ও উপর দিয়ে সীমানার বাইরে গেলে ৬ রান যোগ হয়।

২২. **ডেডবল**– আম্পায়ারের মতে বল পাকাপোক্তভাবে উইকেট রক্ষক বা বোলারের হাতে জমা পড়লে কিংবা বাউন্ডারি হলে অথবা বলটি কোনো ব্যাটসম্যান বা আম্পায়ারের পোশাকের মধ্যে আটকে গেলে বলটি ডেড বলে গণ্য হবে।

২৩. **নো বল**– কোনো বলে ডেলিভারি পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে আম্পায়ার সন্তুষ্ট না হলে তিনি 'নো বল' সংকেত দেবেন।

২৪. **ওয়াইড বল**– বল যদি ব্যাটসম্যানের নাগালের বাইরে এবং মাথার উপর দিয়ে যায় তাহলে আম্পায়ার ওয়াইড সংকেত দেবেন।

২৫. **বাই এবং লেগবাই**– বোলারের বৈধ বল ব্যাটসম্যানের কোথাও স্পর্শ ছাড়া অতিক্রম করে এবং এই সুযোগে সংগৃহীত হয় বাইরান এবং ব্যাটম্যানের হাতে ধরা ব্যাট স্পর্শ বাদে পায়ে বা দেহের কোথায় স্পশৃ করে সংগৃহীত রানকে লেগবাই বলে।

২৬. **আপিল**– ফিল্ডিং দল কর্তৃক কোনো কিছু আপিল না করা হলে আম্পায়ার কোনো ব্যাটসম্যানকে আউট বলে ঘোষণা করবেন না।

২৭. **ব্যাটসম্যান– আউট অব হিজ গ্রাউন্ড** গণ্য হবে যদি তার হাতে ধরা ব্যাটটি বা তার দেহের কোনো অংশ পপিং ক্রিজ লাইনের ভিতর দিকের জমি স্পর্শ করে না থাকে।

২৮. **বোল্ড আউট**– বোলারের বৈধ বলে ব্যাটসম্যান 'বোল্ড' আউট হবেন যদি বলটির আঘাতে উইকেটের 'বেল' পড়ে যায়।

২৯. **টাইমড আউট (Timed Out)**– একজন ব্যাটসম্যান আউট হবার পর ৩ মিনিটের মধ্যে পরবর্তী ব্যাটসম্যান পিচের মধ্যে স্ট্যানস্ পজিশনে না দাঁড়াতে পারলে ফিল্ডিং সাইডের আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে আম্পায়ার টাইমড আউট দিবেন।

৩০. **ক্যাচ আউট**– বলটি ব্যাটে লেগে ভূমি স্পর্শ করার আগেই কোনো ফিল্ডসম্যান যদি লুফে নেয় এবং 'ফিল্ডসম্যান' যদি পুরোপুরি মাঠের ভিতরে থাকে তবে ব্যাটসম্যান 'কট আউট' হবে।

৩১. **হিট উইকেট**– নো বল ছাড়া ব্যাটসম্যান খেলতে গিয়ে তার ব্যাট বা দেহের কোনো অংশ দিয়ে উইকেট ভেঙ্গে গেলে আম্পায়ার হিট উইকেট আউট হবে।

৩২. **এলবিডব্লিউ** – আম্পায়ার যদি মনে করেন যে লেগস্ট্যাম্পের বাইরের বল ছাড়া কোনো বল ব্যাটসম্যানের পায়ে বা শরীরে প্রতিহত না হলে সরাসরি স্ট্যাম্পে আঘাত করত, তবে তিনি ব্যাটসম্যানকেএলবিডব্লিউ হিসেবে আউট করে দিবেন।

৩৩. **রান আউট**– বল খেলে রান নেওয়ার উদ্দেশ্যে উভয় ব্যাটসম্যান দৌড় শুরু করলে পপিং ক্রিজে পৌছার আগেই যদি বিপক্ষ দল কর্তৃক উইকেট ভেঙে দেওয়া হয় তবে ব্যাটসম্যান আউট হবে।

৩৪. **স্ট্যাম্পড আউট**– নো বল ব্যতিত ব্যাটসম্যান বল খেলতে গিয়ে যদি পপিং ক্রিজ থেকে বেরিয়ে যায়, সে সময় বিপক্ষ দলের উইকেট রক্ষক বিধিসম্মত ভাবে উইকেট ভেঙ্গে দেয় তখন ফিল্ডিং দলের আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে আম্পায়ার স্ট্যাম্পড আউট দিবেন।

৩৫. **উইকেট রক্ষক**– উইকেট রক্ষক ফিল্ডিং দলের মধ্যমণি। বোলারের ডেলিভারি করা বল বিধিসম্মতভাবে উইকেটের পিছনে থেকে ধরবে।

৩৬. **ফিল্ডসম্যান**– ফিল্ডার তার দেহের যেকোনো অংশ দিয়ে বল থামাতে পারবে কিন্তু মাঝে রাখা অবস্থায় ফিল্ডারদের ব্যবহৃত যেকোনো বস্তুতে বল লাগলে ব্যাটিং দল ফিল্ডিং দ্যা বলের জন্য ৫ রান পাবেন।

কাজ–১ : ক্রিকেট খেলার মাঠ অঙ্কন করে অবস্থানগুলো উল্লেখ কর।
কাজ–২ : কী কী কারণে একজন ব্যাটসম্যান আউট হয় তা লিখে দেখাও।

২০২৫

পাঠ–৫ : কলাকৌশল

ক্রিকেট খেলার মৌলিক কলাকৌশলগুলোকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : ক. ব্যাটিং, খ. বোলিং, গ. ফিল্ডিং, ঘ. উইকেট কিপিং।

ক. ব্যাটিং : ব্যাটিং শিখতে হলে স্ট্যান্স, ব্যাকলিস্ট, এবং টাইমিং সমন্ধে পারদর্শি হতে হবে।

১. **ব্যাটিং গ্রিপ**– গ্রিপ দুই প্রকার
ক. O (ও) গ্রিপ (O grip)
খ. V (ভি) গ্রিপ (V grip)

ক। ও (O) গ্রিপ - দুই হাত ধরার সময় গোল হয়ে যায় সেইজন্য সব দিকে সট খেলা যায় না।

খ। V (ভি) গ্রিপ - কুঠার ধরার মতো ব্যাটের হাতল ধরতে হয়। এই গ্রীপ সবদিকে শট খেলার জন্য উপযোগী।

ব্যাটিং

২. **স্ট্যান্স (Stance)** : দুই পা পপিং ক্রিজের দুই পাশে দিয়ে ওয়েল ব্যালেন্স অবস্থায় দাঁড়াতে হয়। চোখের দৃষ্টি বলের দিকে থাকবে। বাম/ডান কাঁধ বোলারের দিকে থাকবে।

৩. **ব্যাক লিফ্ট (Back Lift)** : ব্যাটিংয়ের জন্য ব্যাকলিফ্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাকলিফ্ট করার সময় দৃষ্টি বলের দিকে কাঁধ ও কনুই বোলারের দিকে থাকবে। হ্যান্ডেলের উপরের হাতের রিস্ট কক করলে ব্যাট অটোমেটিক্যালি উঠে আসবে।

৪. **টাইমিং (Timing)** – বল সিলেকশন করে ব্যাটসম্যানকে টাইমিং করতে হয়। এই টাইমিং কখনো আত্মরক্ষামূলক আবার কখনো আক্রমণাত্মক হয়।

আত্মরক্ষামূলক টাইমিং দুই ধরনের, ক) ফ্রন্টফুট ডিফেন্স (Front foot defence) খ) ব্যাকফুট ডিফেন্স (Back foot defence)

আক্রমণাত্মকমূলক টাইমিংও দুই ধরনের

ক.ভার্টিক্যাল শট (Vartical shot) (কাভার ড্রাইভ এ্যাস্টেট ড্রাইভ)

খ.হরাইজেন্টাল শট (Horizental shot) (পুল শট, হুক শট, স্যুইপ শট স্কোয়ার কাট ইত্যাদি)

পেছনে সরে গিয়ে যখন বলটিকে আত্মরক্ষামূলকভাবে খেলা হয়, তখন তাকে ব্যাকওয়ার্ড ডিফেন্স স্ট্রোক বলে। এ সময় ডান পা পেছনে নিয়ে ব্যাটের হাতল সামনে এবং মাথা ভেতর দিকে করে বল থামাতে হয়।

৫. **ড্রাইভ বা সজোরে আক্রমণাত্মক বল মারা**– যখন পপিং ক্রিজের বেশ সামনে এক পা এগিয়ে দিয়ে দূরে বল পাঠাবার জন্য সজোরে মারা হয় তখন তাকে ফরওয়ার্ড ড্রাইভ বলে।

৬. আবার কিছুটা পিছনে এসে যখন অনুরূপভাবে বল মারতে হয়, তখন তাকে ব্যাকওয়ার্ড ড্রাইভ বলে।

কাজ–১ : ব্যাট ধরার কৌশলগুলো প্রদর্শন করে দেখাও।
কাজ–২ : ব্যাট তোলা ও বল মারার কৌশলগুলো প্রদর্শন কর।

পাঠ–৬ : বোলিং, ফিল্ডিং, ক্যাচিং, উইকেট কিপিং

বল করার সময় অবশ্যই লক্ষ্যস্থল ও দূরত্বকে নিয়ন্ত্রণ করেই বল করতে হয়। সঠিকভাবে বল করার জন্য কতকগুলো মৌলিক কৌশল রপ্ত করতে হয়। তাহলেই সহজে বল করতে পারা যায়। কৌশলগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো –

বোলিং

১. **বল ধরা** – বোলিং করার সময় বলটাকে সব সময়েই হাতের আঙুলগুলোর মাথা দিয়ে ধরতে হবে। বল কখনো হাতের তালুতে রাখা যাবে না।

২. **বল নিয়ে দৌড়ে আসা**– কতটা দূর থেকে দৌড়ে এসে বল করা উচিত তা নির্ভর করবে কী রকমের বল করা হবে তার ওপর। বল নিয়ে দৌড়ানোর সময় শরীরের ভারসাম্যকে খানিকটা সামনের দিকে ও মাথাটাকে স্থির রাখতে হবে।

বোলিং

৩. **বল ছোড়া**–বল হাত থেকে ছেড়ে বল ছোড়ার আগের মুহূর্তে বাম পায়ের ওপর লাফ দিয়ে শরীরটাকে পাশের দিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান পা–কে সামনে নিয়ে যেতে হবে। ডান হাত মুখের কাছাকাছি এবং বাম হাতটা সোজা ওপরের দিকে এবং দৃষ্টি ব্যাটসম্যানের ওপর রাখতে হবে।

৪. **বল ছোড়ার পদক্ষেপ**– বল ছোড়ার পদক্ষেপ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের পা–কে বোলিং ক্রিজের সমান্তরালে নিয়ে যেতে হবে। বাম কাঁধ ব্যাটসম্যানের দিকে থাকবে। দেহের পিছনটা খানিকটা বাঁকা থাকবে। বলসহ ডান হাত উঁচুতে থাকবে।

৫. **অনুসরণ করা (ফেলো থ্রু)** – ডান কাঁধ ব্যাটসম্যানের দিকে থাকবে। ডান হাত বাঁ পায়ের পাশ দিয়ে পেছনে নিয়ে যেতে হবে। বল ছোড়ার পর দৃষ্টি বলের দিকে থাকবে।

বিভিন্ন রকমের বোলিং –

বোলিং অনেক ধরনের করা যায়। নিচে কয়েক প্রকার সহজ বোলিংয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

১. **ফাস্ট বোলিং**– ফাস্ট বোলিং বা দ্রুত বল করার জন্য বোলারকে ১০ থেকে ১৫ ধাপ বা তার বেশি দূরত্ব নিয়ে জোরে দৌড়ে আসতে হবে। কারণ দ্রুত বল করার জন্য শক্তির প্রয়োজন। ফাস্ট বল গুডলেন্থে অর্থাৎ পপিং ক্রিজের ১.২১ থেকে ১.২২ মিটার এর মধ্যে ফেলতে হয়।

২০২৫

২. **অফ ব্রেক–** এই বোলিং এ বলটাকে 'ব্যাটসম্যানের' ডান অর্থাৎ অফের দিকে ফেলে ভেতরের দিক ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। বলটাকে ঘোরানোর জন্য আঙ্গুলগুলোর সাহায্যে মোচড় দিয়ে বল ফেলতে হবে। বল করার পর হাতের তালু উপরের দিকে থাকে।

৩. **লেগ ব্রেক–** এ সময় বলটাকে ব্যাটসম্যানের বা পায়ের দিকে ফেলে অফ স্ট্যাম্পের দিকে নিয়ে যেতে হয়। বল করার পর হাতের তালু নিচের দিকে যাবে। এ ছাড়া ইন সুইং, আউট সুইং, গুগলি, ইয়র্কার প্রভৃতি কায়দায় বলা করা যায়। তোমরা উপরের ক্লাসে উঠে এগুলো শিখে নেবে।

ফিল্ডিং–

ফিল্ডিং বিভিন্নভাবে এবং মাঠের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে করা হয়। একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **রক্ষণাত্মক ফিল্ডিং–** ব্যাটসম্যানরা যেন দুই, তিন এবং চার রান না নিতে পারে সেইজন্য রক্ষণাত্মক ফিল্ডিং সাজানো হয় । এই সময় বল গড়িয়ে ফিল্ডারের কাছে যায় এবং ফিল্ডার বল ধরে উইকেট রক্ষকের নিকট ফেরত পাঠায়।

উঁচু দিয়ে আসা বল ধরার জন্য বলের গতির দিকে লক্ষ কর। দুই হাতের তালু খোলা রেখে হাত সামনে এগিয়ে দাও এবং বল ধরে টেনে বুকের কাছে নিয়ে এসো। তাহলে হাতে ব্যথা লাগবে না।

২. **আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং–** বল ধরার জন্য ফিল্ডার বলের দিকে দ্রুত যায় এবং দল ধরে উইকেট রক্ষকের কাছে ফেরত পাঠায়। এই ফেরত পাঠানোর কৌশল আবার তিন প্রকার : ১. আন্ডার আর্মথ্রো ২. ওভার আর্মথ্রো ৩.সোল্ডার লেভেল থ্রো

ক্যাচিং

ক্যাচ মিস তো ম্যাচ মিস। তাই ক্যাচ ধরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বলের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখতে হবে। চোখের লাইনে হাত দুটো থাকবে এবং আঙ্গুলগুলো খোলা ও প্রসারিত থাকবে। কনুই দুটো পাশ থেকে সামনে আসবে। বল হাতে আসার সাথে সাথেই আঙ্গুলগুলো বন্ধ করে বুকের কাছে টেনে নিতে হবে। ক্যাচ কয়েক ধরনের হয়।

১.স্লিপ ক্যাচ (Slip Catch) ২. হাই ক্যাচ (High Catch)

৩. গ্রাউন্ড ক্যাচ (Ground Catch) ৪. ফ্ল্যাট ক্যাচ (Flat Catch) ।

উইকেট কিপিং–

উইকেট কিপার দলের মধ্যমণি। উইকেট কিপারের দক্ষতার উপর নির্ভর করে দলের জয়লাভ। সেই জন্য দক্ষ উইকেট কিপার হতে হলে এই সব কৌশলের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কিপিং এর গুরুত্বপূর্ণ ৪ বিষয় হলো-

১. ক্রাউচ (Crouch) ২. গ্লোভওয়ার্ক (Glovework)

৩. পজিশনিং (Positioning) ৪. ফুটওয়ার্ক (Footwork)

১. ক্রাউচ (Crouch) : (গুটিশুটি মেরে থাকা) দুই পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসতে হবে। চোখ দুটি মাটির সমান্তরালে সামনের দিকে থাকবে। হাত দুটি দুই হাঁটুর মাঝখানে দিয়ে মাটি স্পর্শ করে জোড়া অবস্থায় থাকবে।

২. গ্লোভওয়ার্ক (Glovework) : Gloves (হাত মোজা) দুইহাতে গ্লাভস পড়া থাকবে। গ্লাভস সামনের দিকে খোলা অবস্থায় বোলার বরাবর থাকবে।

৩. অবস্থান (Position) : বলের ধরন দেখে উইকেট রক্ষক অবস্থান নিবে। যেমন, স্পিন বলের সময় উইকেটের নিকটে এবং ফাস্ট বলের সময় উইকেটের দূরে অবস্থান নিবে।

৪. পায়ের যাদু (Foot Work) : বল আসার অবস্থান বা দিক দেখে উইকেট কিপার তার পা ও শরীরের অবস্থান পরিবর্তন করে যদি বল ডান দিক দিয়ে আসে তাহলে ডান পা সরিয়ে বল ধরবে। অনুরূপভাবে বাম দিক দিকে আসলে বাম পা সরিয়ে বল ধরতে হবে।

কাজ – ১ : বোলিং অ্যাকশনের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে করে দেখাও।
কাজ – ২ : উইকেট কিপারের অবস্থানগুলো মাঠে প্রদর্শন কর।

পাঠ–৭ ভলিবল

ভলিবল খেলার উৎপত্তি হয় আমেরিকায়। ১৮৯৫ সালে উইলিয়াম জি মর্গান এই খেলার প্রচলন করেন। প্রথমে ভলিবল খেলার নাম ছিল 'মিনটোনেট' এবং তখন এই খেলা হতো রাবারের ব্লাডার দিয়ে। ১৯৪৭ সালে প্যারিসে ১৩ সদস্য দেশ নিয়ে 'ফিভ' বা আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়। বাংলাদেশেও খেলাটি বহুল প্রচলিত। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়।

সাধারণ নিয়মাবলি :

১. ভলিবল খেলার কোর্টের দৈর্ঘ্য ১৮ মিটার ও প্রস্থ ৯ মিটার। কোর্টের সকল দাগের চওড়া ৫ সেন্টিমিটার। কোর্টের দুটি পার্শ্বরেখা ও দুটি প্রান্তরেখা থাকে এবং প্রত্যেকটি রেখাই কোর্টের অন্তর্ভুক্ত।

২. মধ্যরেখার সমান্তরাল করে উভয় পাশে ৩ মিটার দূরে দুটি রেখা টানা হয়। এটাকে আক্রমণ রেখা বলে।

৩. প্রান্তরেখার পেছনে ৯ মিটার এলাকাটাই সার্ভিস অঞ্চল।

৪. মধ্যরেখার লাইন বরাবর পার্শ্ব রেখার ৫০ সে.মি. থেকে ১ মিটার দূরে দুপাশে ২.৫৫ মিটার উচ্চতায় দুটি গোলাকার ও মসৃণ দন্ডের সাথে ১ মিটার চওড়া ৯.৫০ মিটার লম্বা জাল টানানো হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে জালের উচ্চতা হবে ২.৪৩ মিটার এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ২.২৪ মিটার।

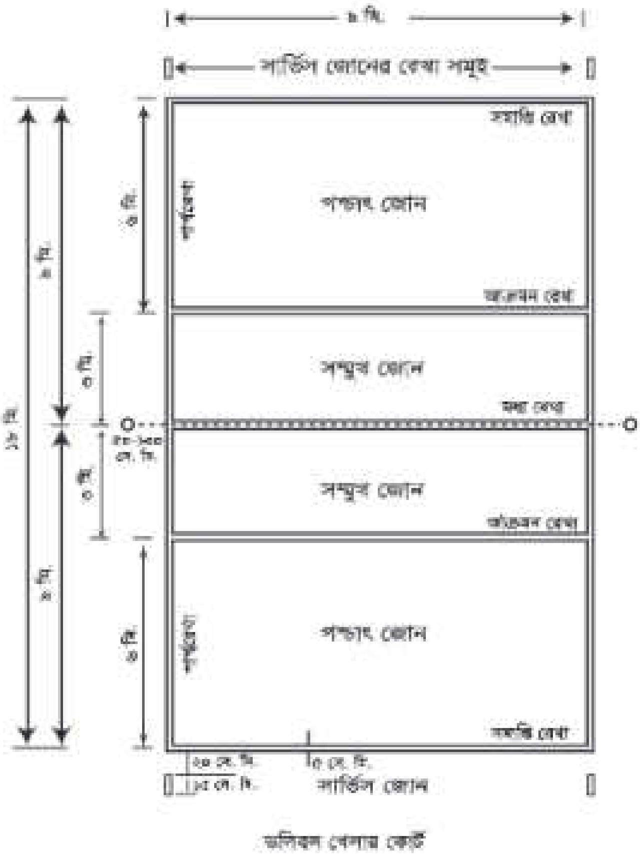

ভলিবল খেলার কোর্ট

জালের দুইধারে পার্শ্বরেখার বরাবরে ১ মিটার লম্বা ও ৫ সে.মি. চওড়া দুটি ফিতা লাগানো থাকবে। ফিতার বাইরের পার্শ্ব দিয়ে খাড়াভাবে লাগানো ১.৮০ মিটার লম্বা ও ১০ মিলিমিটার চওড়া দুটি দণ্ড থাকবে। এই দুটি দণ্ডকে অ্যান্টিনা বলে। দণ্ড দুটি ৮০ সেন্টিমিটার জালের উপরে থাকবে। সম্পূর্ণ দণ্ড দুটি পর্যায়ক্রমে সাদা ও লাল রঙের হবে।

৫. ১২জন খেলোয়াড় নিয়ে একটি দল গঠিত হবে। মাঠে ৬জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলতে হবে। প্রতি সেটে সর্বাধিক ৬জন খেলোয়াড় বদল করা যাবে।

৬. খেলা আরম্ভের সময় সামনের সারিতে ৩জন ও পেছনের সারিতে ৩জন খেলোয়াড় দাঁড়াবে।

৭. টস বিজয়ী দল হয় সার্ভিস করবে বা কোর্ট পছন্দ করবে।

৮. সার্ভিস অঞ্চলে দাঁড়িয়ে বলকে শূন্যে তুলে আঘাত করে সার্ভিস করতে হয়। বলটাকে আঘাত করার পরই সার্ভার কোর্টে প্রবেশ করতে পারবে।

৯. রিসিভিং দল যখনই একটি সার্ভিস লাভ করবে, তখন ঐ দলের সকল খেলোয়াড় ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে একবার তাদের অবস্থান পরিবর্তন করবে। এটাকে রোটেশন পদ্ধতি বলে।

১০. ভলিবল প্রতিযোগিতায় ৫টি সেটের মধ্যে যে দল ৩টি সেটে জয়লাভ করবে সে দলই বিজয়ী হবে।

১১. খেলা চলাকালীন বলকে বিপক্ষের কোর্টে পাঠানোর জন্য একদল সর্বাধিক তিনবার বলটিতে স্পর্শ বা আঘাত করতে পারবে। তবে ব্লকের সময় যদি কোনো স্পর্শ হয়, সেটাকে এই তিনবারের মধ্যে গণনা করা হবে না।

১২. একজন খেলোয়াড় পরপর দুইবার বলে স্পর্শ করতে পারবে না।

১৩. শরীরের যেকোনো অংশ দিয়ে বলে আঘাত করতে পারবে।

১৪. সার্ভিসের বল যদি নেট স্পর্শ করে বিপক্ষ কোর্টে যায় তাহলে সঠিক বলে ধরা হয়।

১৫. বিপক্ষ দলের কোর্টে বল থাকাকালীন নেটের উপর দিয়ে সেই বলকে আঘাত করা যাবে না।

১৬. পেছনের সারির খেলোয়াড়রা কখনই আক্রমণ করতে এসে জালের উপরের লাইনের উচ্চতায় বলকে ফেরত পাঠাতে পারবে না ও ব্লক করতে পারবে না।

১৭. যে দল ভুল করবে সে দল সার্ভিস হারাবে এবং অপর পক্ষ সার্ভিস ও একটি পয়েন্ট লাভ করবে।

১৮. যে দল আগে কমপক্ষে ২ পয়েন্টের ব্যবধানে ২৫ পয়েন্ট অর্জন করবে, সে দল সেট বিজয়ী হবে। যদি উভয় দলের পয়েন্ট ২৪–২৪ হয় তাহলে এক্ষেত্রে ডিউস হবে এবং ২ পয়েন্টের ব্যবধান না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকবে। এভাবে প্রথম থেকে চতুর্থ সেট পর্যন্ত চলবে। পঞ্চম সেটে যে দল আগে ২ পয়েন্টের ব্যবধানে ১৫ পয়েন্ট অর্জন করবে, সে দল বিজয়ী হবে। আর যদি উভয় দলের পয়েন্ট ১৪-১৪ হয়, তাহলে ২ পয়েন্টের ব্যবধান না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকবে।

কলাকৌশল

সার্ভিস– সাধারণত সার্ভিস দুইভাবে করা যায় –

১. কাঁধের নিচে হাত এনে সার্ভিস করা (আন্ডার আর্ম সার্ভিস)।

ক. এক পা সামনে ও এক পা পেছনে রেখে ডান হাঁটু সামান্য ভেঙে পেছনের পায়ে দেহের ওজন রেখে দাঁড়াতে হবে।

খ. সুবিধাজনক হাতের তালুতে বল নিয়ে বিপরীত হাতকে সোজা রেখে পেছনের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

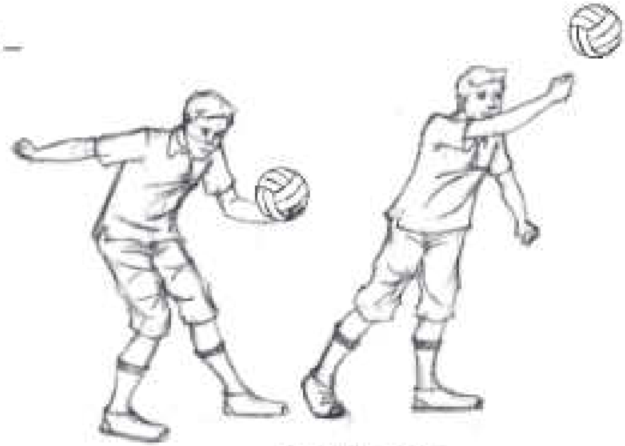

আন্ডার আর্ম সার্ভিস

গ. সুবিধাজনক হাতের বলকে ওপরে শূন্যে তুলে দিয়ে বিপরীত হাতের তালু কিংবা হাতের উপরিভাগ দিয়ে বলে আঘাত করতে হবে।

ঘ. বলে আঘাত করার পর ফলো থ্রু করার জন্য অর্থাৎ সামনে ঝুঁকে পড়ার কারণে শরীরের ওজন সামনের পায়ে নিয়ে যেতে হবে।

২. কাঁধের ওপরে বল তুলে সার্ভিস করা (টেনিস সার্ভিস)

ক. সার্ভিস অঞ্চলে পা দুটোকে আড়াআড়ি করে দুই পায়ের উপর শরীরের সমান ওজন রেখে দাঁড়াতে হবে।

টেনিস সার্ভিস

খ. ডান হাতি খেলোয়াড়ের জন্য বাঁ হাতের তালুতে বল রেখে প্রায় ১ মিটার উঁচুতে বলটাকে ছুড়ে দিতে হবে।

গ. বলটা নিচের দিকে নামার সময় ডান হাতের তালু দিয়ে বলটাকে সজোরে আঘাত করতে হবে।

৩. পাস (Pass) করা- সাধারণত দুভাবে পাস করা যায়–

১. দুহাত মাথার ওপর নিয়ে পাস করা (Upper hand pass) :

ক. বলটিকে সব সময় আঙ্গুলের প্রথম গাঁট ও শেষ প্রান্তের মাঝখানের অংশে নিয়ে স্পর্শ করতে হবে।

খ. হাতের কনুই দুটো কাঁধ বরাবর রাখতে হবে, যাতে ঠিক কপালের সামনে থেকে খেলা যায়।

গ. হাঁটু দুটো ভেঙে দুপায়ের উপর সমান ভর রেখে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়াতে হবে।

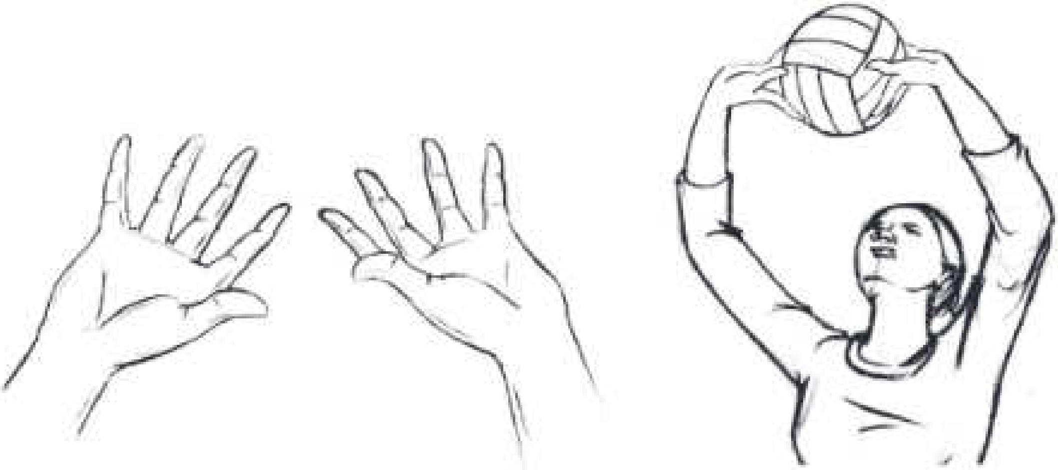

আপার হ্যান্ড পাস

ঘ. বলের ঠিক পেছনে ও নিচের দিকে আঘাত করে সামনে ওপরের দিকে ঠেলে দিতে হবে এবং হাঁটু সোজা করে দাঁড়াতে হবে।

২. কনুই কাঁধের নিচে এনে পাস করা (Under arm pass)

ক. বুড়ো আঙুল বাদে অন্য আঙুলগুলো দিয়ে দুহাতের আঙুলগুলোকে জড়িয়ে ধরে তার উপর বুড়ো আঙুল দুটোকে পাশাপাশি রাখতে হবে।

খ. কনুই দুটোকে এমনভাবে রাখতে হবে, যাতে কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত হাতের অংশটা পাশাপাশি থাকে।

গ. দুই হাঁটু ভেঙে কোমর নিচু করে বলের নিচে শরীরকে নিয়ে যেতে হবে।

ঘ. কনুই এর কিছুটা সামনে থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশ দিয়ে বলকে ওপরে উঠাতে হবে এবং শরীর সোজা করতে হবে।

কাজ–১ : আন্ডার আর্ম সার্ভিস প্রদর্শন করে দেখাও।

কাজ–২ : টেনিস সার্ভিসের কৌশলগুলো প্রদর্শন কর।

পাঠ–৮ : অ্যাথলেটিক্স

খেলাধুলার ক্ষেত্রে দৌড়, ঝাঁপ ও নিক্ষেপকে এক কথায় অ্যাথলেটিক্স বলা হয়।

৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড় : সাধারণত ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়কে মধ্যম দূরত্বের দৌড় বলে। এ দৌড়ের জন্য প্রয়োজন হয় ২০০ মিটার অথবা ৪০০ মিটার অ্যাথলেটিক ট্র্যাক। ট্র্যাকে লেনের সংখ্যা আটটি, তবে স্কুলে কমপক্ষে ছয়টি লেন থাকে। সর্ববামের লেনকে ১ নম্বর লেন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দৌড়ের সময় শরীরের বাম পার্শ্বকে মাঠের ভিতরের দিকে রেখে দৌড়াতে হয়। এই দৌড়ে স্ট্যাগার্ড ব্যবহার করতে হয়। দৌড়ের দূরত্বে সমতা আনার জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তাকে স্ট্যাগার্ড বলে। মনে রাখতে হবে, মধ্যম দূরত্বের দৌড়ে শরীরের সম্পূর্ণ শক্তি একসাথে ব্যয় করতে হয় না। দৌড়ানোর শক্তিকে গোটা দূরত্বে ভাগ করে

নিতে হয়। অর্ধেক বা তিন ভাগের একভাগ দূরত্বে সব শক্তি শেষ করে দিলে আর শেষ প্রান্তে যাওয়া যাবে না। সম্পূর্ণ দূরত্বে শক্তি বণ্টন ক্ষমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম ২০০ মিটার এবং দ্বিতীয় ২০০ মিটার দৌড়ানোর জন্য নেয়া সময়ের ব্যবধান ২ থেকে ৫সেকেন্ডের বেশি হওয়া উচিত নয়। ছোটো দূরত্বের দৌড় আরম্ভের কায়দায় ৪০০ মিটার ও ৮০০ মিটার দৌড় আরম্ভ করার পর আরম্ভ সময়ের গতিবেগ সর্বোচ্চ গতিবেগের চেয়ে সামান্য কম হবে। শেষ চক্কর দৌড়ানোর সময় ২ থেকে ৩ মিটারের বেশি ব্যবধান রাখবে না। মধ্যম দূরত্বের দৌড়ে পায়ের কদম ছোট দৌড়ের চেয়ে বড়ো হবে।

১০০ × ৪ মিটার রিলে দৌড় : এই রিলে বা যুক্তদৌড়ে প্রত্যেক দলে চারজন রানার থাকে। প্রত্যেককে ১০০ মিটার করে দৌড়ে সম্পূর্ণ দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। এ দৌড়ের আরম্ভ কৌশল স্প্রিন্টের অনুরূপ। তবে অতিরিক্ত কৌশল হচ্ছে –

ক. দৌড়ের সময় ব্যাটন বা কাঠি বদল করার জন্য হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে।

খ. যাকে ব্যাটন দেবে তার বুড়ো আঙুলের দ্বারা তৈরি 'ভি' স্থানে কাঠিটি পৌঁছে দিতে হবে।

গ. ব্যাটন হাতে স্পর্শ করার সাথে সাথে ধরে ফেলতে হবে এবং বাঁ হাতে নিয়ে যেতে হবে।

ঘ. ব্যাটন দেওয়া-নেওয়ার সময় উভয়ের দৌড়ের গতি সমান থাকবে।

কাজ–১ : ৪০০ মিটার, ৮০০ মিটার এবং রিলে দৌড়ের আরম্ভ ও সমাপ্ত করার কৌশল প্রদর্শন কর।

কাজ–২ : রিলে দৌড়ের কাঠি বদল কীভাবে করতে হয়, তা মাঠে প্রদর্শন কর।

পাঠ–৯ (ক) : দীর্ঘ লাফ

প্রস্তুতি– ওয়ার্ম আপ বা শরীর গরম ও বিশেষ কিছু ব্যায়ামের মাধ্যমে অ্যাথলেট শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেবে।

নিয়মাবলি

ক. লাফ দেবার জায়গা থেকে ১৬–২০ ধাপ দৌড়ে এসে সুবিধামতো বাম বা ডান পায়ের উপর ভর করে টেক অফ বোর্ডের উপর থেকে লাফ দিতে হবে।

খ. টেক অফ বোর্ডের দৈর্ঘ্য ১.২১–১.২২ মিটার, প্রস্থ ২০ সে.মি. (২ মিলিমিটার কমবেশি হতে পারে), উচ্চতা ১০ সে.মি.। রং সাদা।

গ. অ্যাপ্রোচ রানের দ্রুতগতি বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

ঘ. উভয় পায়ের ওপর একই সাথে অবতরণ করা।

ঙ. মাটিতে অর্থাৎ জাম্পিং পিটে অবতরণ করার সময় হাঁটু 'দ' এর মতো ভাঁজ করে থাকবে যাতে থুতনি হাঁটুতে না লাগে। মাথা সামনে ঝুঁকানো থাকবে।

চ. জাম্পিং পিট– টেক অফ বোর্ড থেকে ল্যান্ডিং এরিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ১০ মিটার। টেক অফ বোর্ড থেকে ল্যান্ডিং এরিয়ার আরম্ভ পর্যন্ত ১–৩ মিটার। প্রস্থ ২.৭৫–৩.০০ মিটার এবং গভীরতা ৩০ সেন্টিমিটার।

কলাকৌশল : দীর্ঘ লাফের মধ্যে সাধারণভাবে চারটি অংশ রয়েছে। প্রথম টেক অফ নেবার জন্য দৌড়, দ্বিতীয় টেক অফ, তৃতীয় শূন্যে অবস্থান এবং শেষে জাম্পিং পিটে অবতরণ।

দৌড়ে আসা (অ্যাপ্রোচ রান)–টেক অফ নেওয়ার জন্য দৌড় ও নির্ভুল পদক্ষেপের উপর লাফের কৃতকার্যতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। সাধ্যমতো অতি দ্রুততার সাথে দৌড়ে টেক অফ বোর্ডের কাছে আসতে হবে। আগে থেকে নিজের পদক্ষেপ ঠিক করে নিতে হবে।

মাটি থেকে ওপরে উঠা (টেক অফ)– মাটি থেকে ওপরে ওঠার জন্য টেক অফ বোর্ডকে পায়ের পাতার সাহায্যে (যে পা দিয়ে মাটি ছাড়া হবে) সজোরে ধাক্কা দিয়ে উপরে উঠতে হবে। ধাক্কা দেওয়ার সময় হাঁটুর সন্ধি সামান্য ভাঙা থাকবে। তারপর পা সম্পূর্ণ সোজা করে নিতে হবে এবং একই সাথে বিপরীত হাঁটু ভেঙে দুলিয়ে সামনে পূর্বে নেওয়া পায়ের সমান করাতে হবে।

শূন্যে অবস্থান (ফ্লাইট)– দেহ উপরে ওঠাবার জন্য হাঁটু টাক করা ('দ' এর মতো), ঝাঁকুনি দিয়ে খুব জোরে পা ছোড়া (হিচ কিক), কোমর দুলিয়ে ও হাত জোরে সামনে দুলিয়ে জাম্পিং পিটে অবতরণ করতে হবে।

অবতরণ (ল্যান্ডিং)– পা জাম্পিং পিটে পড়ামাত্র শরীর সামনে ঝাঁকুনি দিয়ে গড়িয়ে সামনে চলে আসতে হবে।

৯ (খ) গোলক নিক্ষেপ : গোলক নিক্ষেপকে ইংরেজিতে শটপুট বলে। প্রাচীনকালে পাথর নিক্ষেপের প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে এটা লৌহগোলক নিক্ষেপে পরিণত হয়েছে।

নিয়মাবলি

ক. গোলকের ওজন পুরুষের জন্য ৭.২৬ কেজি এবং মহিলাদের জন্য ৪ কেজি। ব্যাস যথাক্রমে ১১–১৩ সেন্টিমিটার ও ৯.৫–১১ সেন্টিমিটার।

খ. গোলক নিক্ষেপের বৃত্তের ব্যাস ২.১৩৫ মিটার। বৃত্তের মাঝ বরাবর বর্ধিত দাগ ৭৫ সেন্টিমিটার।

গ. শটপুটের ল্যান্ডিং অ্যাঙ্গেল ৩৪.৯২ ডিগ্রি।

ঘ. বৃত্তের ভিতর থেকে ৩৪.৯২° সেকটরের মধ্যে নিক্ষেপ করে গোলকটি ফেলতে হবে।

ঙ. প্রত্যেকে তিনটি করে নিক্ষেপের সুযোগ পাবে।

নিক্ষেপের কৌশল : শেখার সুবিধার জন্য কৌশলগুলো নিচে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো :

১। গোলক ধরা

(ক) গোলক হাতের তালু দিয়ে না ধরে আঙুলের গোড়াসহ সম্পূর্ণ দিয়ে ধরতে হবে।

(খ) বুড়ো ও কড়ে আঙুল দিয়ে বলের দুই পাশ ধরে রাখতে হবে, যাতে গড়িয়ে না পড়ে।

২। গোলক কাঁধের উপর রাখা

(ক) গোলকটি গলা ও কাঁধের মিলনস্থলে খাঁজের মধ্যে ঠেলে রাখতে হবে, যাতে গোলকের ভার রাখা যায়।

(খ) ডান হাতের কনুই ডান পাশে খানিকটা উঁচুতে রাখতে হবে।

৩। প্রারম্ভিক অবস্থান

(ক) যেদিকে গোলক ছুড়বে তার বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে।

(খ) ডান পা সামনে বা বাম পায়ের পাতাকে পিছনে নিয়ে ডান পায়ের গোড়ালির কাছে রাখতে হবে।

৪। স্থান পরিবর্তন

(ক) কোমর থেকে উপরের শরীরটাকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দ্রুত বাম পা–কে পিছনে উপরের দিকে দুলিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

(খ) ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে সম্পূর্ণ শরীরটা পিছনের দিকে ঠেলে নিতে হবে।

(গ) এই অবস্থায় লাফানো উচিত নয়।

৫। নিক্ষেপের অবস্থান

(ক) বাম পায়ের হাঁটু না ভেঙে সোজা করে থামের (খুঁটির) মতো রাখতে হবে।

(খ) ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে কোমর থেকে উপরের শরীরটাকে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

(গ) দৃষ্টি পিছনের দিকে রাখবে।

৬। গোলককে ঠেলে দেওয়ার ভঙ্গী

(ক) গোলক শূন্যে ঠেলে দেওয়ার সময় ডান হাতের কনুই কখনো নিচের দিকে নামাবে না।

(খ) গোলকটি আঙুল দিয়ে বাইরের দিকে প্রবল শক্তিতে ঠেলে দিতে হবে।

৭। গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ

(ক) গোলক নিক্ষেপের পর সামনের দিকে ঝুঁকে যাওয়া শরীরের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পিছনের ডান পা কে সামনে নিয়ে হাঁটু ভেঙে দেহটাকে একটু নামিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

কাজ–১ : গোলক ছোড়ার কৌশলগুলো মাঠে প্রদর্শন কর।

পাঠ–১০ উচ্চ লাফ

উচ্চ লাফকে ইংরেজিতে হাইজাম্প বলে। উচ্চ লাফ দেওয়ার ল্যান্ডিং এরিয়ার দৈর্ঘ্য ৫ মিটার, প্রস্থ ৩ মিটার এবং উচ্চতা ৬০ সেন্টিমিটার। ক্রসবারের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার, ওজন ২ কেজি এবং ব্যাস ২৯–৩১ মিলিমিটার। বিভিন্ন পদ্ধতিতে উচ্চ লাফ দেওয়া যায়। যেমন :

ক. সিজার কাট, খ. বেলি রোল, গ. ফসবেরি ফ্লপ

ক. সিজার কাট

১. দৌড়ে আসা (অ্যাপ্রোচ রান)– ৩০°–৪৫° ডিগ্রি কোণ করে বারের দিকে দৌড়ে আসবে। ৮ বা ৯টি বড়ো বড়ো পদক্ষেপ নেবে। শেষের ২ বা ৩টি পদক্ষেপ দ্রুত হবে।

২. মাটি ছেড়ে উঠা– (টেক অফ) যে পায়ে ভর করে উপরে উঠবে অর্থাৎ টেক অফ ফুট ক্রসবার থেকে এক ফুট দূরে রাখবে। বিপরীত পা সজোরে উপরে কিক করবে।

৩. ক্রসবার অতিক্রম করা–(ক্রসবার ক্লিয়ারেন্স)–কিক করা পা হাঁটু ভেঙে ক্রসবারের উপর আনার সাথে সাথে টেক অফ ফুটও একইভাবে আনতে হবে। ক্রসবারের ঠিক উপরে শরীরকে বসার মতো ভঙ্গিতে রাখতে হবে।

৪. মাটিতে নামা (ল্যান্ডিং)–দুই পায়েই অবতরণ করবে। তবে টেক অফ নেয়া পায়ের বিপরীত পা আগে জাম্পিং পিট স্পর্শ করবে।

খ. বেলি রোল

১. দৌড়ে আসা (অ্যাপ্রোচ রান)– ৪৫° কোণ করে ক্রসবারের দিকে দৌড়ে আসবে। দৌড়ে আসার জন্য ৭ বা ৮টি বড়ো বড়ো পদক্ষেপ নিবে। শেষের তিনটি পদক্ষেপ দ্রুত হবে।

২. মাটি ছেড়ে উঠা (টেক অফ)–যে পায়ে ভর করে উপরে উঠবে অর্থাৎ টেক অফ ফুট ক্রসবার থেকে এক ফুট দূরে ফেলতে হবে। অন্য পা সজোরে উপরে কিক করবে।

৩. ক্রসবার অতিক্রম করা (ক্রসবার ক্লিয়ারেন্স)–কোমর ক্রসবারের উপরে উঠলে শরীর ঘোরাতে হবে। ঘোরাবার সময় পেট ক্রসবারের খুবই কাছে থাকবে। এ সময় শরীর উপুড় অবস্থায় ক্রসবারের সমান্তরালে থাকবে।

৪. মাটিতে নামা (ল্যান্ডিং)– যে পায়ে টেক অফ নেবে, তার বিপরীত পা এবং দুই হাতের উপর ভর করে অবতরণ করবে।

গ. ফসবেরি ফ্লপ

১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে আমেরিকার ডিক ফসবেরি এক নতুন পদ্ধতিতে উঁচু লাফ দিয়ে সোনার মেডেল পান এবং তখন থেকেই তার নাম অনুসারে ফসবেরি ফ্লপের প্রচলন। এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হলো, যে পা ক্রসবার থেকে দূরে থাকে, সে পা দিয়ে মাটি ছেড়ে উপরে ওঠা হয় এবং ক্রসবারের উপর দেহটা ক্রসবারের সমান্তরাল থাকে ও পিঠটা ক্রসবারের কাছাকাছি থাকে। এই পদ্ধতির সব থেকে সুবিধা হলো যে শরীরের ভরকেন্দ্র জমি থেকে খুব অল্প তুলেই ক্রসবারকে অনায়াসে ডিঙিয়ে যাওয়া যায়। যেহেতু পিঠের উপর ভর করে নামতে হয়, সেজন্য নিজের নিরাপত্তার কথা সবার আগে চিন্তা করতে হবে। তাই ফোমের ম্যাট ছাড়া কখনই এই লাফ অনুশীলন করা উচিত নয়।

১. **দৌড়ে আসা (অ্যাপ্রোচ রান)**– ক্রসবারের সাথে ৯০° কোণ করে দাঁড়িয়ে দৌড় আরম্ভ করে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে ক্রসবারের কাছে আসতে হয়। শেষের দুটি পদক্ষেপে দেহের ভরকেন্দ্রকে একটু নামিয়ে নিতে হয়।

২. **মাটি ছেড়ে উঠা (টেক অফ)**– মধ্য শরীরটাকে খানিকটা পিছন দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে যে পা দিয়ে মাটি ছাড়া হবে, সে পা–টাকে দেহের ভরকেন্দ্রের সামনে রাখতে হবে। যখনই ভরকেন্দ্রটি টেক অফ নেওয়া পায়ের উপর আসবে, তখনই সেই পা–টাকে হাঁটু সন্ধিতে ভেঙে নিয়ে দ্রুত ও জোরের সাথে উপরের দিকে উঠাতে হবে। একই সাথে অপর পাটাকে দুলিয়ে উপরে ডান কাঁধের লাইনে নিয়ে যেতে হবে, তার ফলে পিঠটা ক্রসবারের দিকে চলে আসবে।

৩. **ক্রসবার অতিক্রম করা (ক্রসবার ক্লিয়ারেন্স)**– যেই মাত্র দেহ মাটি ছেড়ে উপরে উঠবে, সাথে সাথে হাত দুটো পাশের দিকে দেহের সমান্তরালে এনে মাথা, মধ্য শরীর ও কোমরের নিম্নাংশকে ক্রসবারের উপর দিয়ে অতিক্রম করাতে হবে।

৪. **মাটিতে নামা (ল্যান্ডিং)**– হাত ও পা দুটোকে উপরে তুলে দিয়ে পিঠের সাহায্যে ম্যাটের উপর গড়িয়ে যেতে

ফসবেরি ফ্লপ

কাজ–১ : ফসবেরি ফ্লপ কৌশলটির বিভিন্ন ধাপ প্রদর্শন করে দেখাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন খেলাটি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সাফ গেমসে প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়?

ক. হকি খ. বাস্কেটবল গ. কাবাডি ঘ. টেনিস

২. 'রোটেশন' পদ্ধতিতে কোন খেলায় খেলোয়াড়গণ তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেন?

ক. ব্যাডমিন্টন খ. ভলিবল গ. হাডুডু ঘ. হকি

নিচের চিত্র দুটি লক্ষ্য করে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

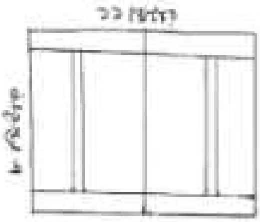

চিত্র : X

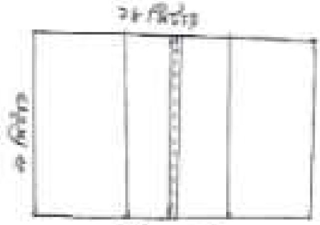

চিত্র : Y

৩. 'X' চিত্রের সাথে কোন শব্দটি সম্পর্কিত?

ক. রোটেশন খ. স্ম্যাশ

গ. স্ট্রাগল ঘ. অফসাইড

৪. 'X' ও 'Y' চিত্রের খেলার সাথে কোন বাক্যটি সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ক. 'X' দেশি খেলা ও 'Y' বিদেশি খেলা

খ. 'X' বিদেশি খেলা ও 'Y' দেশি খেলা

গ. 'X' খেলায় সার্ভিস জোন ও 'Y' খেলায় লবি থাকে কাবাডি

ঘ. 'X' খেলায় রোটেশন ও 'Y' খেলায় লোনা হয়

৫. অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাকে স্ট্যাগার্ড ব্যবহার করা হয় কেন?

ক. দৌড়ের গতিবেগ বৃদ্ধির জন্য

খ. সময়ের ব্যবধান কমানোর জন্য

গ. খেলোয়াড়দের দৌড়ের দূরত্ব সমান করার জন্য

ঘ. সম্পূর্ণ দূরত্বে শক্তি বণ্টনের সুবিধার জন্য

৬. দীর্ঘ লাফ প্রতিযোগিতায়-

i. মাটি থেকে উপরে উঠার সময় টেক অফ বোর্ড ব্যবহার করা হয়

ii. বাম পায়ের পাতাকে পিছনে নিয়ে ডান পায়ের গোড়ালির কাছে রাখা হয়

iii. আগে থেকে নিজের পদক্ষেপ ঠিক করে নিতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিদ্যালয়ের আন্তঃহাউস ফুটবল খেলায় আক্রমন ভাগের খেলোয়াড় ইমন রক্ষণভাগের খেলোয়াড় আরাফকে প্রচন্ড ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। এতে আরাফের হাতে লেগে বল গোললাইন অতিক্রম করে। রেফারির কাছে আক্রমন ভাগের খেলোয়াড়গণ গোলের আবেদন করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

৭. রেফারি গোলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন কেন?

ক. গোলের আগে ইমন অফসাইড করেছিল

খ. গোলের আগে ইমন ফাউল করেছিল

গ. আরাফের হাতের ছোঁয়ায় গোল হয়েছিল

ঘ. ইমন পেনাল্টি এরিয়ার ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল

৮. পরবর্তীতে রেফারি কোন সিদ্ধান্ত দিয়েছিল?

ক. ইমনকে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক দিয়েছিল

খ. আরাফকে ডাইরেক্ট ফ্রি কিক দিয়েছিল

গ. ইমনকে কর্নার কিক দিয়েছিল

ঘ. আরাফকে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক দিয়েছিল

৯. বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কতজন খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করা হয়?

ক. ১০ খ. ১১

গ. ১৪ ঘ. ১৫

১০. উচ্চ লাফ দেওয়ার ল্যান্ডিং এরিয়ার দৈর্ঘ্য কত মিটার?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম–শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন মানুষকে দায়িত্বশীল করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।